শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

স্বীকৃতি

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির ফোটো বাঁকুড়ার সাইমা স্টুডিয়ো কর্তৃক গৃহীত।

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের ছবি তাঁর পুত্র শ্রীরামপ্রসাদ রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের ছবি তাঁর পুত্র শ্রীশুভচারী দাসগুপ্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের ছবি শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

শ্রীচণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ন্যায়তর্কতীর্থ ও শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত।

অন্যান্য ছবি আনন্দবাজার পত্রিকার স্টাফ ফটোগ্রাফার কর্তৃক গৃহীত।

সমুদয় ব্লক আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য

ভূমিকা

নিজেদের চেষ্টা ও চিন্তা দ্বারা যাঁরা বরণীয় হয়েছেন তাঁদের বিষয় জানবার কৌতূহল থাকা সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক। এ কৌতূহল আমারও আছে। আমি তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে এবং আলাপ-আলোচনা ক'রে তাঁদের মুখ থেকেই তাঁদের জীবনের কাহিনী শোনার সৌভাগ্য লাভ ক'রেছি। সে-সৌভাগ্য সঞ্চয় ক'রে না রেখে সকলকে তার অংশী ক'রে নেওয়াই এই রচনাগুলির উদ্দেশ্য। তাঁদের জীবন এবং অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তাঁরা যা বলেছেন আমার মনের মত ক'রে সাজিয়ে আমি তা-ই লিখেছি। কেবল জীবনের কাহিনী পরিবেশন করতে নয়, আমি তাঁদের জীবনের এক-একটি কথাচিত্র আঁকতে চেষ্টা করেছি; কতটা সফল হয়েছি তা পাঠক-সাধারণের বিচার্য। এঁদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমাকে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে এবং বাংলার বাইরেও অনেক জায়গায় ঘুরতে হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কারো কারো সঙ্গে একাধিকবার দেখা করতেও হয়েছে, তার পর তাঁদের বিষয় লিখেছি। সৌভাগ্যের সঙ্গে দুর্ভাগ্যও আছে, বসন্তরঞ্জন রায় ও সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ-আলাপের সুযোগ থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছি; এঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন-সময় স্থির হয়েছে, এমন সময় অকস্মাৎ তাঁরা লোকান্তরিত হন— পরিশিষ্টে এ-বিষয় বিস্তারিত ভাবে উল্লিখিত হল। লেখাগুলি প্রথমে আনন্দবাজার পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়— পরিশিষ্টে প্রকাশের তারিখ দিয়ে দিলাম। কোনো কথা আমার শুনতে বা বুঝতে যদি ভুল হয়ে থাকে, এজন্যে আনন্দবাজারে প্রকাশের আগে লেখাগুলি এবং গ্রন্থাকারে

প্রকাশের আগে প্রুফগুলি তাঁদের দেখিয়ে নিয়েছি। আশা করা যায় এতে সত্যের ও তথ্যের কোনো ভুল না থাকাই সম্ভব।

এই কাজ সময় ও শ্রম সাপেক্ষ। আমার একার উৎসাহে বা উদ্‌যোগে এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। যাঁরা আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আমার দুই পরমসুহৃদ্‌ শ্রীকানাইলাল সরকার ও শ্রীসাগরময় ঘোষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; এঁদের কাছে এজন্যে আমি ঋণী। আর, রচনাগুলি আরম্ভের গোড়া থেকে তথ্যাদি সংগ্রহে সহায়তা ক'রে ও নানাভাবে পরামর্শ দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মাঝেমাঝে পত্রযোগে উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়ে আমাকে অনুগৃহীত করেছেন। শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত একটি জীবনকথার তথ্যসংগ্রহে আমাকে সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলকেই এজন্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

শ্রীরাজশেখর বসু সম্বন্ধে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র বিশ্বভারতীর সৌজন্যে মুদ্রিত হল।

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন শিল্পীবন্ধু শ্রীঅর্ধেন্দু দত্ত।

বালিগঞ্জ

সুশীল রায়

সূচী

সুশীল রায়ের অন্যান্য বই

কবিতা

পাঞ্চালী

সুচরিতাসু

উপন্যাস

একদা

ত্রিবেণী

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু। হিন্দিতে অনূদিত

রুদ্রাক্ষ

গল্প

সুশীল রায়ের গল্পসঞ্চয়ন

ছোটদের

আকাশস্বপ্ন
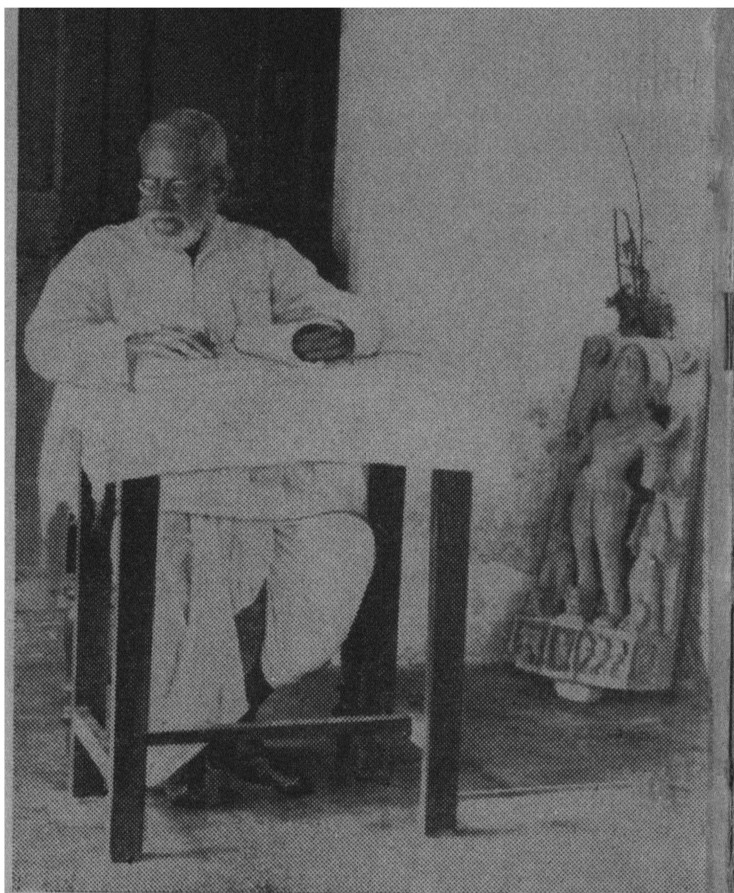
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

বাঁকুড়া। কলকাতা থেকে রেলপথে ১৪৪ মাইল। এইখানে আমাদের বিদ্যানিধি মহাশয় বাস করছেন গত বত্রিশ বৎসর একটানা। বাংলার যে কয়জন মনীষী এখনো আমাদের মধ্যে বর্তমান আছেন বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁদের মধ্যে প্রবীণতম।

তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম কথা। স্মিত হেসে তিনি বললেন, "আমার বয়স কত জান?"

জানতাম। কিন্তু তাঁর মুখ থেকেই শোনার জন্যে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। বললেন, "বিরানব্বই বৎসর। বিরানব্বই বৎসর নয় মাস।"

কিন্তু এখনো তাঁর শরীর শক্ত আছে। তবে ক্ষীণদৃষ্টি হয়ে পড়েছেন। প্রায় আড়াই ঘণ্টা তিনি একটানা কথা ব'লে গেলেন। শেষের দিকে বললাম, "আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন নি তো?"

বললেন, "না, অভ্যাস আছে।"

অভ্যাস আছে। কেননা, এখন নিজে হাতে তিনি স্বাক্ষর করা ছাড়া বড় বেশি লিখতে পারেন না, তাই তাঁর একজন অনুলেখক আছেন। বিদ্যানিধি মহাশয় ব'লে যান, আর অনুলেখক লেখেন। গলার স্বর একটু দুর্বল হয়েছে, কিন্তু মাথার শক্তি হ্রাস হয় নি, এখনো তিনি দুরূহ গবেষণার কাজে লিপ্ত। বললেন, "সম্প্রতি একটা অতিশয় দুরূহ বিষয়ে পুস্তক-প্রকাশের চেষ্টায় আছি। বইখানির নাম 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল'। সম্পূর্ণ মৌলিক বিষয়। এর সাহায্যে এখন বেদপাঠীরা বেদের দেবতা চিনতে পারবেন; তাঁরা দেখবেন, বেদে খ্রীষ্টজন্মের আট হাজার বৎসর পূর্বের ঋষিদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে।"

বিদ্যানিধি মহাশয় নামেই বঙ্গবাসী ও বঙ্গসাহিত্য তাঁকে চেনে। ১৯১০ সালে পুরীর পণ্ডিত-সভা তাঁকে 'বিদ্যানিধি' উপাধি দেন। তাঁর আরও উপাধি আছে। তাঁর পুরো নাম হচ্ছে শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এম. এ., বিদ্যানিধি, বিজ্ঞানভূষণ, এফ. আর. এ. এস., এফ. আর. এম. এস., রায়বাহাদুর।

বিদ্যানিধি মহাশয় বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর গ্রন্থ 'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ' সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মন্তব্য করেছিলেন, 'মাতৃভাষার হিতকামনায় অঙ্গুল্যগ্র-গণনীয় যে কতিপয় সুশিক্ষিত আছেন, তন্মধ্যে আপনি একজন শ্রেষ্ঠ।·· আপনি যে বঙ্গসরস্বতীর জন্য একখানি সুবৃহৎ জ্যোতির্ময় মুকুটের নির্মাণ করিয়াছেন, সেই আকাশোল্লাসী-মহামূল্য-মুকুট মস্তকে সগর্বে পরিধান করিয়া বঙ্গসরস্বতীর নির্মল মুখমণ্ডল আজ স্মিতরেখায় উদ্ভাষিত। মাতাকে এই হার পরাইয়া এই মুকুটে মাতাকে বিভূষিত করিয়া আপনি ধন্য হইয়াছেন, বঙ্গভূমিকে ধন্য করিয়াছেন, বঙ্গবাসীকে গর্বিত হইবার অধিকার দিয়াছেন।'

তবুও বিদ্যানিধি মহাশয় নিজেকে সাহিত্যিক ব'লে স্বীকার করতে সম্মত হলেন না। আমি তাঁর সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন, "আমি তো সাহিত্যিক নই।"

হয়তো নিজেকে তিনি বিজ্ঞানসাধক হিসাবেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁর সেই সাধনার সিদ্ধির সুযোগে তাঁর অজ্ঞাতসারেই বঙ্গসাহিত্যও সমৃদ্ধ হয়েছে।

বয়সের হিসাবে তিনি রবীন্দ্রনাথেরও জ্যেষ্ঠ। ১৭৮১ শক ৪ কার্তিক ইংরেজি ১৮৫৯ সালের ২০ অকটোবর তারিখে বৃহস্পতিবার হুগলী জেলার আরামবাগের চার মাইল দক্ষিণে দিগ্‌ড়া গ্রামে তাঁর জন্ম হয়।

নয় বৎসর বয়স পর্যন্ত বাড়িতে পাঠশালায় লেখাপড়া করেন। এর পর তাঁর পিতা তাঁকে বাঁকুড়ায় নিয়ে আসেন। তখন তাঁর পিতা বাঁকুড়ার

সদরআলা (এখনকার সবজজ) ছিলেন। মাস দুই-তিন এখানকার বঙ্গ-বিদ্যালয়ে প'ড়ে এখানকার জেলা ইস্কুলে তাঁর ইংরেজিতে হাতেখড়ি হয়। পর বৎসর অক্টোবর মাসে তাঁর পিতার কাল হয়। তাঁরা বাড়ি ফিরে যান।

বললেন, "এর দু-তিন মাস পরে আমাদের অঞ্চলে ম্যালেরিয়া মহামারী গ্রাম-কে-গ্রাম উজাড় করে চলেছিল। এই রোগ বর্ধমান থেকে দক্ষিণ দিকে চ'লে আসে। ছয় মাসেব মধ্যে গ্রামের দশ আনা লোক মারা যায়। তখন অনেক গ্রামেরই দশা এইরূপ হয়েছিল। এখন সেই ভীষণ ম্যালেরিয়া কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। মৃতদেহ পোড়াবার লোক ছিল না, কাঁদবার লোক ছিল না। ওষুধপত্র কিছু ছিল না বললেই হয়। কেউ কেউ শুনেছিল, কুইনিন নামে একটি মহৌষধ আছে, কিন্তু তা পাওয়া যেত না। শত শত লোকে ধর্মঠাকুরের দুয়ার ধ'রে বেঁচে গেল। জগদম্বার কৃপায় আমিও বেঁচে গেলাম। জীবনের এই দুটি বৎসরের কথা মনে পড়ে না, আমি বেঁচে ছিলাম না মরে ছিলাম, জানি না। তখন আমার বয়স বারো।"

আশি বছর আগের কথা। আশি বছর আগের বাংলার একটি দুঃখময় অসহায় অবস্থার চিত্র যেন দেখতে পেলাম এই বিবৃতির মধ্য দিয়ে। বিদ্যানিধি মহাশয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, তাঁর চোখের সম্মুখে সেই ভয়ংকর দৃশ্য এখনো স্পষ্টরূপে আঁকা হয়ে আছে। আশি বছর আগের কথা। অথচ তাঁর মনে হচ্ছে, এটা মাত্র সেদিনের ঘটনা।

ক্রমে বর্ধমানে ম্যালেরিয়া একটু কমেছিল। তিনি বর্ধমান-মহারাজার ইস্কুলে পাঁচ বছর প'ড়ে এনট্রান্স পাশ করেন দশ টাকা বৃত্তি সহ। তারপর হুগলী কলেজে ভর্তি হন। সেখানে এফ. এ. পাশ করে কুড়ি টাকা বৃত্তি পান। তার পরে ১৮৮২ সালে প্রথম বিভাগে বি. এ. এবং পর বৎসর এম. এ. অনার্স পাশ করেন।

১৮৮৩ সালে এম. এ. পাশ করার পরই কটক কলেজে লেকচারার ইন্ সায়ান্স নিযুক্ত হন। কটক কলেজে তিনি তখন একাই বিজ্ঞানের শিক্ষক। চারটি শ্রেণী ছাড়াও এম. এ. ক্লাসের ছাত্র ছিল একজন। এতগুলি ক্লাস নিয়ে এবং এম. এ.-ছাত্রটিকে পড়িয়ে তাঁর দেহ-মন ক্লান্ত হয়ে পড়ত। তিনি বললেন, "তখনকার দিনে শিক্ষাবিভাগে সরকারের কৃপণতা ছিল। আমাকে দিয়ে দুজন শিক্ষকের কাজ করিয়ে নিত। এম. এ-ছাত্রটি এম. এ. পাশ করে। সে-ই কটক কলেজের প্রথম এম. এ.।"

তিন বছর কটক কলেজে কাজ করার পর তিনি কলকাতার মাদ্রাসা কলেজে আসেন। তখন ডক্টর হর্নলে মাদ্রাসা কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। ডক্টর হর্নলে বিদ্যানিধি মহাশয়কে শ্রদ্ধা করতেন, অনেক বিষয় তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন।

"কটক কলেজে আমি কেবল পড়িয়েছি, নিজে পড়বার-শেখবার সময় পাই নি; মাদ্রাসা কলেজে এসে আমার যথেষ্ট অবসর হল। সেখানে মাত্র দু'টি এফ. এ ক্লাস ছিল, বি. এ ক্লাস ছিল না। ডক্টর হর্নলে আমার পড়াশুনার আবশ্যক বই ও সুযোগ ক'রে দিতেন।" বিদ্যানিধি মহাশয় বিশেষ তৃপ্তির সঙ্গে বললেন।

এই মাদ্রাসা কলেজে তিনি দুই বৎসর থাকেন। এর পর মাদ্রাসার কলেজ-বিভাগ প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। মাস দেড়েক তিনি চট্টগ্রাম কলেজে, তার পর মাস পাঁচ-ছয় প্রেসিডেন্সি কলেজে থাকেন। কটক কলেজ থেকে তিন বছর তিনি অনুপস্থিত। এই সময় সেখানে বিজ্ঞান-শিক্ষা অনাদৃত হয়েছিল; এই কারণে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর তাঁকে পুনরায় কটকে পাঠিয়ে দেন।

তিনি বললেন, "এই দ্বিতীয়বার কটকে গিয়ে সেখানকার কলেজে একটানা ত্রিশ বৎসর কাজ করি। তার পর ১৯১৯ সালে কর্ম থেকে

অবসর নিয়ে ১৯২০ সালে বাঁকুড়ায় আসি। তদবধি বাঁকুড়াতেই আছি।"

দশ বৎসর বয়সে তিনি বাঁকুড়া ত্যাগ করেন, অর্ধ শতাব্দী বাদে ষাট বৎসর বয়সে ফিরে আসেন সেই বাঁকুড়ায়। গত বত্রিশ বছর ধ'রে এখানেই তাঁর বিজ্ঞান তথা সাহিত্য সাধনা চলেছে। প্রথম তিন বৎসর ভাড়া-বাড়িতে কষ্ট পেয়ে এক নির্জন স্থানে নিজে বাড়ি করেন। স্বস্তির জন্য বাড়ি, তাই এই বাড়ির নাম রেখেছেন 'স্বস্তিক'।

অহল্যাবাঈ রোড। স্টেশন থেকে রাস্তাটি শহর পেরিয়ে সোজা চ'লে গেছে জেলা ইস্কুল ও কলেজ ছাড়িয়ে পশ্চিম দিকে। এই রাস্তার দক্ষিণ দিকে ছোট এক ফালি পথ। এই পথে কয়েক পা এগিয়ে গেলেই বিদ্যানিধি মহাশয়ের বাড়ি। এক নিরালা নিভৃতি দিয়ে যেন ঘেরা আছে বাড়িটা। অবসরে পূর্ণ জীবনের একান্ত মনে বাস করার পক্ষে জায়গাটি লোভনীয়।

২২শে শ্রাবণ ১৩৫৯, ৭ই অগস্ট ১৯৫২। বেলা চারটের সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করার কথা। হোটেল থেকে বেরিয়ে বাজারের কাছে এসে ফটো-স্টুডিয়োকে ব'লে গেলাম আধঘণ্টা বাদে বিদ্যানিধি মহাশয়ের বাড়িতে আসতে। আমি একটা সাইকেল-রিক্শা নিয়ে আগে রওনা হলাম। রিক্শা চলেছে আর আমি অনবরত ঘড়ি দেখছি— দেরি হয়ে না যায়। সময় সম্বন্ধে তিনি নাকি ভয়ংকর সজাগ। কিন্তু দেরি হয়ে গেল দশ মিনিট। রিক্শা আমাকে অযথা অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

বিদ্যানিধি মহাশয় অপেক্ষা ক'রে বসে ছিলেন। গিয়েই বললাম, চেঁচিয়েই বলতে হল, কানে তিনি এখন কম শুনতে পান, বললাম, "দশ মিনিট দেরি হয়ে গেল।"

আমার দিকে তাকালেন, দেখলাম রুষ্ট হন নি। বললেন, "আমার বয়স কত জান? বিরানব্বই বৎসর। বিরানব্বই বৎসর নয় মাস।"

সময়কে মেপে মেপে চলেছেন, সময়ের অপচয় করেন নি, তাই সময়ও বুঝি তাঁর উপর সদয়। তাই তাঁকে এতদিন টিকিয়ে রেখেছে আমাদের মধ্যে।

তিনি একে একে বলে গেলেন তাঁর জীবনের কথা, তাঁর সময়ের কথা, এর মধ্যে এক সময় এল ফটোগ্রাফার। তাঁর কয়েকটা ছবি নেওয়া হল।

তার পর বললেন, "আমি বাল্যে ও যৌবনকালে দেশের যে অবস্থা দেখেছি, এখন তার এত অবনতি হয়েছে—এক এক সময় বিশ্বাস হয় না। আজকাল মিথ্যা, প্রবঞ্চনা বেড়েছে। বাল্যকালে দেখেছি, লোকে টাকা কর্জ নিত, কিন্তু তমস্থক লেখা-পড়া ছিল না। কর্তাদের খাতায় লেখা হত, তাই যথেষ্ট। খাতকরা যে ঠকাত না, এমন নয়; দু-একজন প্রতারক অবশ্যই নিল; কিন্তু তারা সংখ্যায় ছিল অল্প। লোকে মোটা ভাত মোটা কাপড় পেলেই তুষ্ট হত। সকলে ভাত পেত, কিন্তু কাপড়ের অভাব ছিল। সকলের কাপাস চাষ ছিল না, ঘরে চরকা ছিল না, দাম দিয়ে কাপড় কিনতে হত। কাপড় খাদি (ক্ষুদ্র), হাঁটুর চার আঙুল নীচে পর্যন্ত ঝুলত। অভাব-বোধ ছিল অল্প, সভ্যতার এমন চাকচিক্য তখন ছিল না। কাঁধে চাদর ফেলে খালি গায়ে সভায় গিয়ে বসতে লজ্জিত হত না কেউ। গ্রামে বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই থাকত। গ্রাম-শাসনের চমৎকার ব্যবস্থা ছিল। এখন আইনের দ্বারা তা সম্ভব নয়।"

মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহের কথা তুললেন তিনি, বললেন, "এ আমাদের চেনা জিনিস। বাল্যকাল থেকেই দেখেছি, লোকে কোনো কিছুর প্রাপ্য আদায় করতে হলে তার বাড়ি গিয়ে ধর্না দিয়ে পড়ত। প্রাণান্ত অনশনকে 'হত্যা দেওয়া' বলত। গ্রামে কোনো পাপীকে দণ্ড দিতে হলে তাকে একঘরে' ক'রে রাখার নিয়ম ছিল। এতে পাপী দু-দিনও তিষ্ঠতে পারত না। এ-ই তো অসহযোগ।"

আজকালকার পৃথিবী তাঁর চোখে নতুন রূপে দেখা দিয়েছে, মানুষেরা বদলে গিয়েছে, মানুষের মন গিয়েছে পালটে। আজকাল দেশে এসেছে কল, দেশে এসেছে ভেজাল। এতে লোকের দুর্গতি ক্রমশ বেড়েই চলেছে বলে তিনি মন্তব্য করলেন। বললেন, "সাধে কি মহাত্মা কলের বিরোধী ছিলেন? একটা ধান-কল পঞ্চাশ-ষাট জন বিধবা নারীর মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে। একটা আখমাড়া-কল কত লোকের অন্ন কেড়ে নিয়েছে তার ঠিক নেই। এখন সবাই সাদা-ধবধবে চিনি খাবে, গুড় খাবে না। চরকায় সুতো কেটে খদ্দর বুনে তাঁতিকুলেব ও দরিদ্র নারীর ভরণপোষণের দিন আজ গত।"

তাঁদের সময় ছিল সহযোগের যুগ। সকলের সঙ্গে সকলের ছিল অন্তরঙ্গতা ও আত্মীযতা, সকলের সঙ্গে ছিল সকলের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। কেউ কাউকে তাই ঠকাতে চাইত না। চাইলেও টিকতে পাবত না। আজকাল খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেওযার রেওয়াজ হয়েছে। এর মূলে আছে অর্থলোভ এবং পরস্পর পরিচয় ও আত্মীয়তার অভাব। কিন্তু তাঁদের কালে লোকে ভেজাল কথাটাই জানত না। গ্রামেব তেলী তেল জোগাত, কে কাকে ঠকাবে? তাকে তো গ্রামেই বাস করতে হবে। তখন যে-কোনো আবশ্যক জিনিস গ্রামে বা নিকটের গ্রামেই পাওয়া যেত। বললেন "সবার সঙ্গে চেনা-পরিচয়। একজনকে ঠকিয়ে ক'দিন টিকতে পারবে?"

তাঁর বাল্যের জীবন, তাঁর বিদ্যারম্ভের জীবন, বিদ্যাদানের জীবন সম্বন্ধে কিছু জানা গেল। কিন্তু তাঁর বর্তমান-জীবন অর্থাৎ বিদ্যানিধি-জীবনের সূত্রপাত হল কী করে?— দ্বিতীয়বার যখন তিনি কটক যান তখন অসাধারণ জ্যোতির্বিদ চন্দ্রশেখর সিংহ সামন্তর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন পঞ্জিকা-সংস্কার বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার

টোলের পরিদর্শক। তিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই পণ্ডিতবর্গের সঙ্গে পঞ্জিকা-সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। দৈবাৎ তিনি শুনতে পান যে, উড়িষ্যার এক পার্বত্য ও জাঙ্গল রাজ্যে এক ব্যক্তি আছেন, তিনি নিজে নাকি গ্রহ-নক্ষত্র বেধ করে কী-সব করেন, লোকে বলে তিনি জ্যোতিষী। এই জ্যোতিষী-রাজ্যের নাম খণ্ডপড়া, কটক থেকে পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরে অবস্থিত। এই জ্যোতিষীর নাম চন্দ্রশেখর। সাধারণ লোকের কাছে তিনি পঠানী সান্ত নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি খণ্ডপড়ার তৎকালীন রাজার খুল্লতাত ছিলেন। রাজার অনুমতি ব্যতীত তিনি গড়ের বার হতে পারতেন না। ন্যায়রত্ন মহাশয় কমিশনার সাহেবকে দিয়ে পঠানী সান্তকে রাজার নামে চিঠি দিয়ে কটকে আনান।

বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, "সেই সময় তাঁর বিদ্যাবত্তার, বিশেষ জ্যোতির্বিদ্যার, প্রগাঢ় প্রত্যক্ষ জ্ঞান দেখে আমি আমাদের জ্যোতিষের প্রতি আকৃষ্ট হই। দৈবক্রমে তাঁর রচিত সিদ্ধান্তদর্পণঃ নামে সংস্কৃত গ্রন্থ আমাকে পড়তে, বুঝতে ও সম্পাদন করতে হয়।"

সিদ্ধান্তদর্পণের মুখবন্ধে পঠানী সান্তের জীবনচরিত তিনি ইংরেজিতে লেখেন। এর ফলে এদেশে ও বিলাতে পঠানী সান্তের অদ্ভুত কৃতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা হয়। ১৯১০ সালে যখন পুরীর পণ্ডিতসভা শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায়কে বিদ্যানিধি উপাধি দেন, তখন মানপত্রে তাঁকে চন্দ্রশেখরের আবিষ্কর্তা ব'লে উল্লেখ করেন।

কটকে অবস্থানকালে তিনি পরিচিত হন যাদবেশ্বর তর্করত্নের সঙ্গে। তর্করত্ন মহাশয় তখন তাঁর পুত্রের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যে কিছুদিন কটকে ছিলেন। তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য ও প্রখর তর্কবিদ্যার অধিকারী ছিলেন।

বিদ্যানিধি মহাশয় বললেন, "সেকালের পণ্ডিতেরা বাস্তবিক পণ্ডিত ছিলেন। শুধু একটা বিষয়ে নয়, নানা বিষয়ে তাঁরা চর্চা করতেন। পুরীর

মহামহোপাধ্যায় সদাশিব কাব্যকণ্ঠ 'কল্যাপদ্ধর্মসর্বস্বম্' নামে ৮০০ পৃষ্ঠার এক নিবন্ধ লিখেছিলেন।"

তিনি এক শ্রুতিধরের কাহিনী বললেন। তাঁর নাম ঘট্টুলাল। মহারাষ্ট্রীয় শতাবধানী। পাঁচ বছর বয়সে বসন্তরোগে তাঁর দু-চোখ নষ্ট হয়ে যায়। তিনি পিতামাতার মুখে শাস্ত্রপাঠ শুনতেন, আর একবার শুনেই কণ্ঠস্থ হয়ে যেত। একবার কটকে তাঁকে পরীক্ষা করা হয়। এক আসরে কেউ আবৃত্তি করল ইংরেজি এক লাইনের দুটো শব্দ, তার পরেই অপর একজন বাংলায় এক লাইনের দুটো শব্দ, ইতিমধ্যে কেউ দিল ঘণ্টায় এক ঘা, কেউ ডুগীতে এক ঘা, তারপর আবার আবৃত্তি ওড়িয়ায় এক লাইনের দুটো শব্দ —এই রকম চলল অনেকবার। অবশেষে ঘট্টুলাল ব'লে গেলেন ক'বার বেজেছে ঘণ্টা, ক'বার ডুগী, ইংরেজি-বাংলা-ওড়িয়ায় বলা হয়েছে কি কি কথা।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের জীবনের সাধনার ও প্রেরণার উৎস পণ্ডিতসংসর্গ। এঁদের সংসর্গ ও সাহচর্য তাঁকে জ্ঞানান্বেষণ ও জ্ঞান-বিতরণের পথে চালিত করেছে বলা যায়।

আর তিনি বললেন, উড়িষ্যার দুই-তিন জন দেশীয় রাজ্যের তদানীন্তন রাজার কথা। ময়ুরভঞ্জের মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেও— প্রবাসীতে (১৩৪১ কার্তিক) এঁর সম্বন্ধে তিনি লিখেওছেন; দ্বিতীয় জন কেওঞ্জরের মহারাজা ধনুর্জয় নারায়ণ ভঞ্জ দেও; তৃতীয় জন বামণ্ডার (বামড়া) মহারাজা সার্ বাসুদেব সুঢলদেব। এঁদের গুণরাশি দ্বারা তিনি আকৃষ্ট হন কি ভাবে, তা অকপটে তিনি বললেন।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের অগ্রজের ইচ্ছা ছিল যে, বিদ্যানিধি মহাশয় উকিল হন। এই হেতু তিনি হুগলী কলেজে পড়বার সময় দু বৎসর ল' লেকচার শুনে ছিলেন এবং কটকে গিয়ে তৃতীয় বর্ষ সমাপ্ত করেছিলেন। কিন্তু

ওকালতি পরীক্ষা দেন নি। অগ্রজেব ইচ্ছা পূর্ণ যদি তিনি করতেন তাহলে হয়তো বঙ্গবাসী তাঁকে চিনতে পাবত না, হয়তো তিনি তাঁব ক্ষমতাব বিকাশ কবাবও স্থযোগ পেতেন না, হয়তো তাঁব জীবন অন্য খাতে গড়িয়ে যেত। কিন্তু তিনি কটকে প্রথম বাব গিয়ে তাঁব প্রতিবেশী দুজন উকিলেব অবস্থা দেখেন। এতে ওকালতিব উপব তাঁব ঘৃণা জন্মে' দুজনেই ছিলেন নব্যউকিল। তাঁদেব নিজেব বলতে এতটুকু সময় ছিল না। একজন মক্কেলের আশায় বাড়িতে ব'সে থাকতেন, আব একজন চোব ও বদমায়েশ নিয়ে সময় কাটাতেন।—"আমি সেই সময় ওকালতি-মোহ কাটিয়ে শিক্ষা-বিভাগে চিবদিন থাকব, এই সংকল্প কবেছিলাম।"

তিনি একটু থামলেন। কি-যেন মনে হল তাঁব। বললেন, "আমি বাঁকুড়াব ছাতনায বড়ু চণ্ডীদাসকে প্রতিষ্ঠিত কবেছি। বড়ু চণ্ডীদাস সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতেন না। বড়ু আব দ্বিজ চণ্ডীদাস যে দুই পৃথক কবি, তা কাবো মনে ওঠে নি। 'বাসলী ও চণ্ডীদাস' নামে ১৩০।১৪০ বৎসব পূর্বেব এক পুথি পেয়েছি। সে পুঁথি চণ্ডীদাস-চবিত নামে প্রকাশ কবেছি। কোনো কোনো পণ্ডিত বইখানাকে জাল মনে কবেছেন। কিন্তু এব মধ্যে এমন-সব পুরাতন তথ্য আছে যে, ইদানীং কোনো লোক সেসব জানতে পাবে না। বড়ু চণ্ডীদাসেব নামে প্রচলিত 'সবাব উপবে মানুষ সত্য' কথাটাব মানেও কেউ বুঝত না।"

তাঁব বচনা শুরু 'নব্যভাবত' পত্রিকায, দেবীপ্রসন্ন বায়চৌধুবী ছিলেন সম্পাদক; তিন-চাবটি প্রবন্ধ এই পত্রিকায় লেখেন। তারপব 'দাসী' পত্রিকায় 'নানা কথা' নাম দিযে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে লেখেন। 'প্রবাসী' পত্রিকাব জন্মকাল থেকে এতে লিখছেন। আব লিখেছেন 'বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ পত্রিকা'য়, স্থবেশ সমাজপতিব 'সাহিত্যে', নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে', 'ভাবতবর্ষে'। 'প্রবাসী'তেই লিখেছেন সবচেয়ে বেশি।

বললেন, "লিখতাম বটে, কিন্তু বাংলা ভাষা কখনো শিখি নি, শিখবার অবসর পাই নি। তারপর বাংলা ভাষা শিখতে বসি। তারই ফলস্বরূপ 'বাঙ্গালা ভাষা' নামে দুই ভাগে বিভক্ত ব্যাকরণ ও শব্দকোষ সংকলন করি। বাংলা ভাষা চর্চা করবার সময় দেখি, বাংলা সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষরের সংস্কার করতে না পারলে এই ভাষা শিক্ষা সহজ হবে না। রেফাক্রান্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বর্জন, সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষরের আকাররক্ষণ এখন অনেকে প্রেসে চলেছে। কিন্তু আমিই প্রথম ১৯১২ সালে সূত্র ধরিয়ে দিই। আমার শব্দকোষ এইরকম অক্ষরে ছাপা হয়েছে।"

তাঁর জ্ঞান-চর্চার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৫১ সালে তিনি তাঁর *Ancient Indian Life* গ্রন্থের জন্যে রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন; এবং ১৯৫২ সালে 'পূজাপার্বণ' গ্রন্থের জন্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁকে রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী মেডাল ও সরোজিনী মেডাল দিয়ে সম্মানিত করেছেন। তিনি এই বয়সেও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের, বিজ্ঞান পরিষদের, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য এবং কটকের উৎকল সাহিত্য সমাজের বরেণ্য সভ্য আছেন।

তিনি ৩৬ বৎসর শিক্ষকতা করেন। তারই মধ্যে যে অল্পস্বল্প অবসর পেতেন সেই সময়কে তিনি তিন ভাগে ভাগ করেন। প্রত্যেকটির জন্যে বারোটি করে বছর কাটিয়েছেন। "আমি প্রায় ১২ বৎসর বাংলা ভাষা চর্চা করেছি, ১২ বৎসর জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করেছি, আর ১২ বৎসর কেটেছে দেশীয় কলা চর্চায়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে স্বদেশী ও চরকার নামগন্ধ ছিল না। আমি কটকে 'স্বদেশী ভাণ্ডার' খুলেছিলাম। আর, ছ'মাস চরকার উন্নতি চিন্তা করেছিলাম। 'প্রবাসী'তে (১৩১৩। ৪র্থ সংখ্যা) সে সম্বন্ধে লিখেছি।"

বাইরে নেমে এসেছে অন্ধকার। একটু বাদেই তরল হয়ে এল সে অন্ধকার। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ভরে গেল চারদিক। বাঁকুড়ার এই নতুন-পটীতে এসে নতুন স্বাদ গ্রহণ করে এলাম। প্রায় এক শতাব্দী পূর্বের বাংলাদেশের সঙ্গে যেন সাক্ষাৎ-পরিচয় হল। এই নিভৃতে ব'সে সেই পুরাতন বাংলার যে প্রতিনিধি তপস্যায় মগ্ন, মনে হল সেই তপস্যার তাপ যেন একটু লেগেছে আমার গায়ে।

পদধূলি নিয়ে নেমে এলাম রাস্তায়। অহল্যাবাঈ রোড। ঘড়িতে তখন রাত সাড়ে সাতটা। ফিরতি ট্রেন নটা দশে।

র'চত গ্রন্থাবলী

সরল পদার্থ বিজ্ঞান। খ্রী ১৮৮৬

সরল প্রাকৃত ভূগোল। বাং ১২৯৫

সরল রসায়ন। খ্রী ১৮৯৮

A Primer of Physiography। খ্রী ১৮৯৯

আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ। খ্রী ১৯০৩

হিন্দু জ্যোতিষের উৎপত্তি, বিকাশ, পরিণতি; পুরাণের জ্যোতিষ; চন্দ্রসূর্যাদি গ্রহগণের আকৃতি, পরিমাণ, গতি, অন্তর; ফলিত জ্যোতিষের মূল—ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা

রত্নপরীক্ষা। খ্রী ১৯০৩

হীরা-মানিক প্রভৃতি রত্ন সম্বন্ধে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে প্রমাণ উদ্ধৃতি সহ বিশদ আলোচনা

পত্রালী। খ্রী ১৯০৩

বিজ্ঞানের তত্ত্ব কাব্যরসে সিক্ত ক'রে আলোচনা

বৃত্তি পেতেন মাসে এক টাকা বা পাঁচ সিকা। কোনো ছাত্র প্রথমে এলে তার বিচার হত, তারপর তার বৃত্তি ঠিক হত। আগে কোনো ছাত্র এলে সেখানে শাস্ত্রীয় তর্ক হত। আর এখন?" একটু থেমে বললেন, "এখন আসে স্বার্থসিদ্ধির জন্যে।"

তাঁর দিকে চেয়ে মনে হল যেন তিনি আক্ষেপ করছেন। হয়তো ভাবছেন, সব এমন গোলমাল হয়ে গেল কেন। তাঁরা তাঁদের জীবন সমর্পণ করেছেন যে শাস্ত্রীয় যজ্ঞের অগ্নিতে, আজ সে যজ্ঞের অনল এমন নিস্তেজ হয়ে এসেছে কেন। তাঁর জীবন স্তিমিত হয়ে এসেছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে যজ্ঞের তাপ কমে আসবে কেন। নূতন কেউ কি নেই এর ইন্ধন জোগাবার জন্যে?

বললেন, "শিশুকাল থেকে শাস্ত্রের প্রতি আকর্ষণ বোধ করি। আমার পিতার নাম গুরুদাস বিদ্যারত্ন। সম্ভবত পিতার বিদ্যানুশীলনের স্পৃহাই আমার মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করেছিল। নিজের গ্রামে ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করে ফরিদপুর জেলার কোরকদি গ্রামে জানকীনাথ তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট গিয়ে ন্যায়শাস্ত্রের পাঠ আরম্ভ করি। তারপর নবদ্বীপে এসে হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র পড়তে থাকি। অতঃপর বাংলার অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করি, ন্যায়রত্ন মহাশয় ভট্টপল্লী ত্যাগ করে কাশীধামে গেলে তাঁর সঙ্গে কাশী যাই ও পাঠ সমাপ্ত করি।"

অতি সংক্ষেপে তিনি তাঁর ছাত্রজীবন বিবৃত করে গেলেন। মনে হল, যেন এত সহজেই তিনি ন্যায়ের পাঠ সাঙ্গ করেছেন। অথচ এ কাজ অত সহজে সিদ্ধ হয়নি। ১৮৯০ সালে হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুকালে তাঁর চতুষ্পাঠীতে ছাত্রসংখ্যা ছিল পঁচাত্তর জন। এত অধিক ছাত্র সচরাচর কোনো টোলে হয় না। কিন্তু হরিনাথের শিক্ষাদানের

পদ্ধতির গুণেই ছাত্রগণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতেন। চণ্ডীদাস ছিলেন সেই ছাত্রদের অন্যতম। হরিনাথের ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কভূষণ ও মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ.

ছাত্রজীবনে চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ নবদ্বীপে আগেও এসেছেন। ১৯২৫ সালে তিনি এখানে এলেন অধ্যাপক-পদ গ্রহণ করে। আশুতোষ তর্কভষণের মৃত্যুর পর সেই শূন্যপদে অধিষ্ঠিত হন তাঁরই সতীর্থ চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ। তিনি এখানে এলেন গবর্নমেণ্টের ন্যায়াধ্যাপকরূপে। তদবধি নবদ্বীপেই আছেন। একটানা চব্বিশ বৎসর এই অধ্যাপক-পদ অলংকৃত করে গত ১৯৪৯ সালের নবেম্বর মাসে অবসর গ্রহণ করেন। গবর্নমেণ্টের অধ্যাপক হলেও অবসর গ্রহণের পরে পেন্সনের নিয়ম এখানে নাই কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অসাধারণ বিদ্যাবত্তার জন্য গবর্নমেণ্ট বিশেষ ব্যবস্থার দ্বারা তাঁকে মাসিক এক শত টাকা হারে পেন্সন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। জস্টিস বিজনবিহারী মুখোপাধ্যায় এই ব্যবস্থার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগ করেছিলেন বলে ইনি কৃতজ্ঞতা জানালেন।

তাঁর পুত্রদের মধ্যে মাত্র একজন সংস্কৃত-শিক্ষার ধারা রক্ষা করে চলেছেন, ইনি উপস্থিত ছিলেন; এবং যেসব কথা আমি ধরতে পারছিলাম না, তাঁর পিতার সেই কথাগুলি তিনি আমাকে বলে দিচ্ছিলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, "নবদ্বীপে অনেকদিন আছেন। অনেক দেখেছেন। কার কথা আজ বেশি করে মনে পড়ে আপনার ?"

বললেন, "মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন। ১৯২০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। আমি এখানে অধ্যাপক-পদ নিয়ে আসার আগে। কিন্তু তাঁকে আমি তার আগে থেকেই চিনি ও জানি। নবদ্বীপে আগেও এসেছি পাঁচ-ছয় বার। তিনি ছিলেন নবদ্বীপের রত্ন। দ্ব্যর্থমূলক সরস শ্লোক

রচনায় তাঁর কৃতিত্ব ছিল অপ্রতিহত। সভায় এসে দ্রুত শ্লোক রচনা দ্বারা সভ্যগণকে মোহিত করতে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। তিনি কেবল সুকবি ছিলেন, এমন নয়; তাঁর ন্যায় শাব্দিক ও আলংকারিক তৎকালে এদেশে দেখা যায় নি। তাঁর রচিত শ্লোকাবলী লোকের মুখে মুখে আজও চলেছে, সেগুলি সংকলিত হলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হতে পারে। তাঁর রচিত কাব্য বকদূত অভিনব শ্লিষ্ট দূতকাব্য —এতে তৎকালীন নবদ্বীপের বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে।"

সাধকে সাধকে বিরোধ নেই বলায় সবটা বলা হয় না, সাধকে সাধকে আছে পরস্পারের প্রতি অনুরাগ। এই জন্যেই বৈষ্ণব-পীঠস্থানে আগমেশ্বরীতলা চিহ্নিত হয়েছে এবং এই জন্যেই চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ অজিতনাথ ন্যায়রত্নের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

গুণের প্রতি ও গুণীর প্রতি এইরূপ আকর্ষণ ছিল বলেই সেকালে গড়ে উঠেছিল বিবুধজননী। এবং একালে সেই টান শিথিল হয়ে এসেছে বলেই চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থের ন্যায় পরম বৃদ্ধ মহাপণ্ডিতের জড়িত গলায়ও আক্ষেপের ধ্বনি বেজে উঠতে শোনা গেছে। হয়তো তিনি ভাবছেন, সাতাশ বছর আগে যখন তিনি অধ্যাপকরূপে এলেন এই নবদ্বীপে, তখন এর শ্রী ছিল কতটা এবং আজই বা এর শ্রী কতটা। তাঁরা এবার চলে যাবেন, তার পর এর রূপের আরও অবনতি ঘটবে কি না— এই হয়তো তাঁর আশঙ্কা।

একটানা অনেকক্ষণ একভাবে কথা বলে চলেছেন। মনে হচ্ছে ওঁর নিশ্চয়ই খুব অসুবিধে হচ্ছে এতে। পায়ের উপরে একটি চাদর, গায়ে একটি ছোট জামা। একটি মাংসস্তূপের মত তিনি বসে। শরীর নড়ছে না, কিন্তু ঠোঁট দুটো অনবরতই নড়ছে। তিনি আজ তাঁর জীবনের সব কথা বলে ফেলার জন্য যেন তৈরি হয়ে বসেছেন। কিন্তু সব কথা আমি বুঝতে পারছি নে।

হঠাৎ অট্টহাস্য করে উঠলেন, প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ। প্রায় নব্বই বছরের এই অথর্ব বৃদ্ধের মুখে এই অট্টহাস্য শুনে চমকেই উঠলাম। কথার প্রসঙ্গের সঙ্গে হাসির কোনো যোগ খুঁজে পেলাম না। বাংলাদেশের পণ-প্রথার কথা বলতে গিয়ে তিনি হেসে উঠেছেন। জানিনে, এই হাসির পিছনে কোনো হাহাকার লুকানো আছে কি না।

হেসে ঢোক গিলে বললেন, "ছারখার হয়ে গেল দেশটা। এই প্রথাটা দেশের সর্বনাশ ঘটাল। এ পাপ দেশ থেকে দূর না হলে দেশের কল্যাণ নেই। এর বিরুদ্ধে আপনারা জোর করে লিখুন! এ প্রথা বন্ধ করে দিন।"

অট্টহাস্য করার সাধ্য নেই, মনে মনে হাসলাম। কাগজে দু' কলম লেখার উপর এঁর কতখানি আস্থা। কিন্তু এ কাজ কেবল কাগজে লিখলেই যে হবে না, দেশের জননায়কদের ও সমাজসেবীদেরও এ কাজে যে উদ্যোগী হতে হবে—তা না হলে যে কিছুতেই কিছু হবে না, এ কথা আর তাঁকে বললাম না।

বললেন, "জীবনধারণের জন্যে অর্থের দরকার। কিন্তু জীবনের জন্যে অর্থ না ভেবে যদি অর্থের জন্যেই জীবন মনে করা যায়, তাহলে তখনই অনর্থ শুরু হয়। এখন টোলে ছাত্র পাওয়া দায়। সংস্কৃতশিক্ষার ধারা যে বজায় থাকবে, তার নিশ্চয়তা কী? একজন সাধারণ তর্কতীর্থ আর একজন সাধারণ বি. এ.— এ দুয়ের বাজার-মূল্যের পার্থক্য দেখলেই সব বুঝতে পারবেন। নগদ বিদায়ের যুগ পড়েছে, তাই যেদিকে আর্থিক লাভ কিছু বেশি, সেই দিকেই সকলে ঝুঁকছে।"

এই প্রসঙ্গে একটা গল্প বললেন। তাঁর ছেলে যে-টোল চালাচ্ছেন, তাতে একটি ছাত্র ভর্তি হ'য়ে কিছুদিন লেখাপড়া করে চলে যায়। সে দেখল এদিকে তার আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা কম। সে টোল ছেড়ে দিয়ে রেল-ইঞ্জিনের ফায়ারম্যানের কাজ নিল। দু-তিন বছরের মধ্যেই তার

উন্নতি হয়ে গেল, সে এখন ইঞ্জিন-ড্রাইভার— মাসিক বেতন পাচ্ছে নাকি সাড়ে তিন শ টাকা।

বললেন, "এসব প্রলোভন ছেড়ে ছেলেরা সংস্কৃত টোলে পড়তে চাইবে কেন? কিন্তু সংস্কৃত যদি এইভাবে চর্চাহীন হয়ে পড়ে, তার ফল কখনো ভালো হবে না।"

জীবনের সায়াহ্নে বসে আজ তিনি হয়তো ভাবছেন, নতুন আর-একটা জীবন পেলে নতুন করে সংস্কৃত-শিক্ষণের জন্যে তিনি উদ্যোগী হতে পারতেন। কিন্তু দেহের শক্তি যতই ক্ষীণ হয়ে আসছে, সেইসঙ্গে চারিদিকের আবহাওয়াও যখন বিশেষ অনুকূল বলে ঠেকছে না—তখন নিজেকে অসহায় মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

বললেন, "কিন্তু কেবল সরকারী ব্যবস্থা দিয়েই সব হয় না। সেটা একটা যন্ত্রের মত জিনিস। আসল কথা, দেশের লোকের মন বদল করতে হবে, রুচি বদলাতে হবে। দেশের মাটিকে, দেশের বাতাসকে, দেশের ভাষাকে ভালোবাসতে শেখাতে হবে। এটা যদি হয়, তাহলে আর কোনো চিন্তাই নেই। তাহলে নিশ্চিন্তে মৃত্যুবরণ করতে পারি। এই শরীর নিয়ে এভাবে বেঁচে লাভ কী? পৃথিবীর কোনো কাজেই আর লাগছিনে যখন, তখন আর থেকে দরকার? আর কোনো আশাও রাখিনে, একমাত্র আশা এখন—মৃত্যুর। এই আশা নিয়ে বেঁচে আছি।"

চোখ বুজলেন চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ। দুই গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

তাঁকে আর-কিছু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হল না। এতক্ষণ কথা বলে তিনি ক্লান্তও হয়েছেন। তাঁর পুত্র ছিলেন পাশে, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম।

স্বর্গত গুরুদাস বিদ্যারত্ন তাঁর আত্মজীবনচরিতে চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন। এই বই ১৩১৩ সনে প্রকাশিত হয়েছে।

গুরুদাস বিদ্যারত্ন তাঁর গ্রন্থে চণ্ডীদাসের মেধা ও অধ্যবসায় সম্বন্ধে প্রভূত প্রশংসা করেছেন।

অধ্যয়নের প্রতি তাঁর টান ছিল অত্যন্ত প্রবল, অধ্যয়নকালে ইনি এমনই তন্ময় হয়ে যেতেন যে, কোনো কোনো দিন রাত্রে আহারের কথা পর্যন্ত ভুলে যেতেন। পাকা টোলে ছাত্রাবস্থায় স্বপাক খাওয়ার রীতি ছিল। চাকর এসে উনুনে আঁচ দিয়ে যেত, কিন্তু উনুন কখন নিভে ঠাণ্ডা হয়ে যেত, সে খেয়ালও এঁর হত না, রান্না করাও হত না। অনাহারেই রাত কেটে যেত।

যতগুলি পরীক্ষা দিয়েছেন, তাতে বরাবর প্রথম স্থান অধিকার করেছেন চণ্ডীদাস। প্রাচীন ন্যায়ের পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে ৩৩০৲ টাকা পুরস্কার ও একটি স্বর্ণ-কেয়ূর পান; নব্যন্যায়ের উপাধি-পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে ১৮০৲ টাকা পুরস্কার, একটি স্বর্ণ-পদক ও একটি স্বর্ণ-কেয়ূর পান।

অধ্যয়ন শেষ ক'রে তিনি টাঙাইলের অন্তর্গত সন্তোষের জমিদার রাণী দিনমণি চৌধুরাণীর প্রতিষ্ঠিত বিন্যাফৈর সংস্কৃত কলেজে সাত বৎসর ন্যায়-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন, তৎপর কাশিমবাজার নিবাসিনী রাণী আন্নাকালী-দেবী প্রতিষ্ঠিত বহরমপুর জুবিলি টোলে একুশ বৎসর অধ্যাপনা করে নবদ্বীপে আসেন অধ্যাপক-পদ নিয়ে ১৯২৫ সালে।

চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ যেমন অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক, অন্যদিকে তেমনি ব্রাহ্মণ্যধর্ম-রক্ষার প্রতীক। দীর্ঘকাল যাবৎ ইনি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার সভাপতিত্ব করছেন।

একটা সুদীর্ঘ জীবন তিনি কাটিয়ে দিয়েছেন শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করে। তাতে যে অমৃত উঠেছে তা আকণ্ঠ পানও করেছেন। তবু তৃষ্ণা হয়তো মেটেনি। এখনো জ্ঞানের পিপাসায় কণ্ঠ হয়তো তাঁর শুষ্ক। কিন্তু আর শক্তিও নেই,

আর সামর্থ্যও নেই। তাই তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে চোখ বুজে চিন্তা করেন তাঁর গতজীবনের কথা— যে জীবনটা কেটে গিয়েছে বিদ্যা-আহরণে ও বিদ্যা-বিতরণে। যা তিনি অর্জন করেছেন নিজের চেষ্টায় ও সাধনায়, সেই জ্ঞান তিনি বণ্টন করে দিয়েছেন তাঁর ছাত্রদের মধ্যে। তাঁর অধ্যাপনা-কালে বহু ছাত্র ন্যায়শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হয়েছেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্কৃতশাস্ত্রের গবেষণা-বিভাগের গবেষক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগচী তর্কবেদান্ততীর্থ তাঁরই ছাত্র।

দেশবিদেশ থেকে মহা মহা পণ্ডিতগণ এসে মিলিত হন এই নবদ্বীপে। এই পণ্ডিত-সম্মেলনের মধ্যে অদ্বিতীয়ত্ব অর্জন করার মত জ্ঞান অভিজ্ঞতা বিদ্যা ও বিনয় দিয়ে তৈরি যে পুরুষ তাঁকে দেখলে বোঝার উপায় নেই যে, ইনিই সেই অসামান্য মনীষী। অতি সাধারণ জীবন যাপন করে চলেছেন। নবদ্বীপের আগমেশ্বরীতলার একটি সরু গলির শেষে একটি ভাড়াটে কুঠিতে বাস করছেন পণ্ডিত চণ্ডীদাস।

বাড়িটার চারদিক চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। সকালের রোদ এসে উঠোন ও বারান্দা ভরে দিয়েছে। ভালো লাগছিল এই আবহাওয়াটা। গাছে গাছে পাখির ডাক আছে, চড়াই ও শালিকের চটুল ছুটোছুটি আছে। উঁচু দাওয়ার উপর মাঝে মাঝে উড়ন্ত চিলের পাখার ছায়া পড়ছে। এইটেই হয়তো জীবনের পরম শান্তি— এই রৌদ্র আর এই ছায়া এবং এই মনোমুগ্ধকর পরিবেশ। কিছু একটা লাভ চাই শেষজীবনে। আর-কিছু না হোক. নবদ্বীপের ভাড়াটে কুঠির এই রমণীয় পরিবেশটাই হয়তো পরম লাভ পণ্ডিত চণ্ডীদাসের।

উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করতেই তিনি আমার দুটো হাত ব্যগ্র আন্তরিকতার সঙ্গে চেপে ধরে আবেগের সঙ্গে জড়িত গলায় বললেন, "অভ্যর্থনায় যদি কোনো ত্রুটি হয়ে থাকে. তাহলে মার্জনা করবেন।"

এমন কথার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। নিজেকে অপরাধী বলে মনে হতে লাগল, এর কী উত্তর দেব ভেবে পেলাম না।

ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। বারান্দা ডিঙিয়ে উঠোনে নামলাম, উঠোন ডিঙিয়ে সরু গলিতে, গলি পার হয়ে রাস্তায়। তাঁর শেষ কথাটায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। বড় রাস্তায় পৌঁছে হাঁটতে শুরু করলাম। কানের মধ্যে বাজতে লাগল তাঁর শেষ কথাটা, একটু পরেই তা ছাপিয়ে বেজে উঠল তাঁর সেই অট্টহাস্যটা।

সম্পাদিত গ্রন্থ

কুসুমাঞ্জলিকারিকা। উদয়নাচার্য। আশুতোষ সংস্কৃত সিরিজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বসন্তরঞ্জন রায়

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের কথা লিখতে বসে অন্য কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। কবি বায়রন বলেছেন যে, একদিন এক সুপ্রভাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে তিনি দেখলেন, তিনি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছেন; তাঁর খ্যাতিটা তাঁর কাছে এসেছিল এমনি আকস্মিকভাবে। আর এক-জন হচ্ছেন ন্যুট হ্যামসন; দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে তিনি লিখলেন একটা বই, তার নাম দিলেন হাঙ্গার। তিনি তখন অখ্যাত অজ্ঞাত ও নেহাতই সাধারণ একটি যুবক। তাঁর রচিত গ্রন্থটি প্রকাশের জন্যে তিনি কয়েকটি প্রকাশকের দ্বারস্থ হন। অবশেষে একটি পুস্তক-প্রকাশ-প্রতিষ্ঠান অনুগ্রহ দেখালেন তাঁর প্রতি— তাঁর পাণ্ডুলিপিটি পড়ে দেখবেন বলে স্বীকৃত হলেন। হ্যামসন দিয়ে এলেন তাঁর লেখাটা। কিছুদিন পর সেই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক-মণ্ডলীর বৈঠকে পাণ্ডুলিপি পড়া আরম্ভ হল, সকলে মনোযোগ দিয়ে শুনে যাচ্ছেন: অবশেষে পড়া যখন শেষ হল তখন একজন বলে উঠলেন, 'নাম কি, নাম কি লেখকের?' যাঁর হাতে পাণ্ডুলিপি ছিল, তিনি পাতা উল্টে নামটি পড়লেন, বলে উঠলেন—'ন্যুট হ্যামসন'। মনে হল, সারা পৃথিবীকে উদ্দেশ ক'রে ঘোষণা করা হল নামটি। হ্যামসন অবিলম্বে জগদ্বিখ্যাত হয়ে গেলেন।

বসন্তরঞ্জনের জীবনেও অনেকটা এই রকমই ঘটনা ঘটেছে। লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে বসে নির্জনে তিনি বঙ্গভারতীর পূজা করে চলেছেন। এই নেপথ্যপূজারীর পরিচয় কেউ জানত না। কিন্তু একটি শুভদিন এসে গেল ১৩১৮ সালে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক। একদিন বসন্তরঞ্জন এসে তাঁকে সংবাদ দিলেন যে, বসন্তরঞ্জন

চণ্ডীদাসের একটা নূতন পুস্তক আবিষ্কার করেছেন। এ পুস্তক এমন পুস্তক যে কেউ এর অস্তিত্ব জানত না। সংবাদ শুনে চমকে উঠলেন রামেন্দ্রসুন্দর। এবং হয়তো সেইসঙ্গে চমকে উঠল সারা বাংলাদেশটাই। সঙ্গেসঙ্গে অজ্ঞাত বসন্তরঞ্জন প্রখ্যাত হয়ে উঠলেন। অপরিচিতির যে পর্দার আড়ালে তিনি ছিলেন, সেই পর্দা যেন উঠে গেল। বাংলা সুধীমণ্ডলীর সম্মুখে উদ্ঘাটিত হল বসন্তরঞ্জনের প্রকৃত পরিচয়।

পুঁথি-অন্বেষণ করা বসন্তরঞ্জনের আবাল্যের অভ্যাস।—

যদি কোথা দেখ ছাই
খুঁজিয়া দেখিবে তাই
পাইলে পাইতে পার অমূল্য রতন।

এই উপদেশবাক্যটি তিনি অক্ষরে-অক্ষবে পালন করে গিয়েছেন। পুঁথি-অন্বেষণের অভ্যাস ছিল ব'লেই তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সামান্য একটি সংবাদেব উপর নির্ভর করে দুর্গম বন-বাদাড় ভেদ করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটেছেন, যদি কোনো অমূল্য রতন পাওয়া যায়। সব-কয়টি অমূল্য না হলেও অনেক রত্ন তিনি উদ্ধার করেছেন— প্রায় ৮০০ পুঁথি তিনি সংগ্রহ করেছেন। এইভাবে খুঁজতে খুঁজতে একদিন তিনি সত্যিই পেয়ে গেলেন একটি অমূল্য রত্নই— চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এবং এই আবিষ্কারের শুভসংবাদটি তিনি গিয়ে প্রথমেই দিলেন রামেন্দ্রসুন্দরকে।

বসন্তরঞ্জন এ সম্বন্ধে বলেছেন— পুঁথির আদ্যন্তবিহীন খণ্ডিতাংশে কবির পরিচয়, রচনাকাল, লিপিকাল প্রভৃতি কিছুই পাওয়া যায় নি. এমনকি, পুঁথির নামটি পর্যন্ত না। চণ্ডীদাস-বিরচিত কৃষ্ণকীর্তনের অস্তিত্বের কথা অনেকদিন থেকে তিনি শুনে আসছিলেন, এতদিনে তার সমাধান হল। তিনি যে পুঁথি উদ্ধার করেছেন সেইটিই সেই কৃষ্ণকীর্তন, এই ধারণায় এ পুঁথির নাম দেওয়া হয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

চণ্ডীদাসের পদাবলীর সঙ্গে আমরা পরিচিত। কিন্তু সে-পদাবলীর ভাষা তো আমাদের সমসাময়িক ভাষারই শামিল। তাহলে কি চণ্ডীদাসের আমলেও বাংলা ভাষার রূপ ছিল আধুনিক বাংলার মতই? তা সম্ভব নয়। খাঁটি চণ্ডীদাসী ভাষা গায়কদের হাতে ও বিভিন্ন সময়ের পুঁথিলেখকদের হাতে পড়ে পরিমার্জিত ও পরিচ্ছন্ন হতে হতে আমাদের কাছে এসে যখন পৌছল, তখন আমরা তাতে পেলাম একালের ভাষা। আমরা পেলাম—

সই, কে বা শুনাইল শ্যাম নাম

কিন্তু, পুরাতন আমলের ভাষা তো এ রকম হওয়া সম্ভব নয়, সে ভাষা হবে—

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি

কালিনা নই কূলে

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যে পদ পাওয়া গেছে, তা হচ্ছে এই পদ, তা হচ্ছে এই ভাষা—অকৃত্রিম ও অমার্জিত, অসংস্কৃত ও অনাধুনিকতাপাদিত পুরাতন বাংলার গ্রাম্য পদকারের ভাষা।

এই পুঁথি আবিষ্কারের পর এর কালনির্ণয়ের জন্যে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে সেটি দাখিল করা হয়। তিনি বিচার ও পরীক্ষা করে বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বাংলা পুঁথি।

বসন্তরঞ্জন সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বাংলা পুঁথির আবিষ্কর্তার গৌরব অর্জন করেছেন। এটি তিনি সংগ্রহ করছেন বন-বিষ্ণুপুরের সন্নিকট কাঁকিল্যা গ্রামে।

১২৭২ সনের, ইংরেজি ১৮৬৫ সালের, মহাষ্টমীর পূর্ববর্তী অষ্টমী তিথিতে বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামে বসন্তরঞ্জনের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম রামনারায়ণ রায়। বেলিয়াতোড়ের এই রায়পরিবার অভিজাত সমৃদ্ধশালী ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। এই পরিবারে শিল্পী যামিনী রায়ও জন্মগ্রহণ করেন, তিনি বসন্তরঞ্জনের খুড়তুতো ভাই।

ছেলেবেলা থেকেই বৈষ্ণব পদাবলী ও পদকর্তাদের প্রতি তাঁর টান হয়। বিশেষ করে বিদ্যাপতির প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল একটু মাত্রাছাড়া। তিনি বলেছেন, "স্কুলের বন্ধুরা আমাকে বিদ্যাপতি বলে ঠাট্টা করত। পুঁথি-সাহিত্যের উপর আমার টান দেখে, আর ফেলে-দেওয়া কাগজপত্র ঘাঁটতাম বলে আমাকে পাগল বলত।"

ছেলেদের শিক্ষা দেওয়ার যা প্রচলিত নিয়ম সেই অনুসারেই তাঁর বিদ্যারম্ভ হয়। কিন্তু স্কুলের সে বাঁধা-ধরা বিদ্যা তাঁর বেশি দূর এগোয় নি। ধীরে ধীরে স্কুলের পরীক্ষায় পাশ করে করে তিনি এগিয়ে চললেন। তার পর "পুরুলিয়া জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা-পরীক্ষা দিলাম। কিন্তু অঙ্কের পরীক্ষায় পাশ করতে পারলাম না। এনট্রান্স ফেল করলাম। আমার ছাত্রজীবনও শেষ হয়ে গেল।"

অর্থাৎ ধরা-বাঁধা নিয়মের ছাত্রজীবন তাঁর শেষ হল এখানে। কিন্তু যে ছাত্রজীবনে বাঁধ নেই, বেড়া নেই, নিয়ম নেই, কানুন নেই, সেই নিজের পাঠশালার ছাত্রজীবন শুরু হল তাঁর এখন। তিনি নিজের উৎসাহে, নিজের উদ্দীপনায় এবং নিজের মনের তাগিদে নিজের রাস্তা নির্মাণ আরম্ভ করলেন নিজের হাতে। যে পুঁথি সকলে পড়ে গেছে সে পুঁথিতে মন তাঁর বসল না, নিজের রচিত রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে তিনি সেই পুঁথির সন্ধান আরম্ভ করে দিলেন, যে পুথি আগে কেউ পড়ে নি, যে পুঁথির সন্ধান আগে কেউ জানে নি। এ এক অভিনব ছাত্রজীবন। নিজের পাঠের জন্যে পুঁথি-আবিষ্কারে মগ্ন হলেন এই অভিনব বিদ্যার্থী। "গ্রামে গ্রামে ঘুরে পুঁথির সন্ধান কিরূপ ক্লেশকর ও আয়াসসাধ্য, তা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কাউকে বোঝানো কঠিন। সুদূর মফস্বলের সর্বত্র যানবাহন সুলভ নয়। পথ কোথাও দুর্গম, কোথাও কোথাও পথ নাই বললেও হয়। ছোট বড় অসুবিধেও ঢের। আকর্ষণ—স্বভাবের শোভা দর্শনের সুযোগ, তথা সমাজের সকল স্তরের লোকের সঙ্গে

ঘনিষ্ঠভাবে মিলনে অবসর। এই অনুসন্ধান-কার্যে বহু বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এক ক্ষেত্রে জীবন-সংশয় ঘটে। এত সত্ত্বেও পুঁথি খোঁজায় একটা মোহ ছিল, কি জানি, কেমন সুখ পেতাম। তারই প্রলোভনে পুনঃপুনঃ পুঁথির অন্বেষণে বাহির হয়ে আট শতের বেশি পুঁথি সংগ্রহ করতে পেরেছি এবং বিলোপসাধন আশঙ্কায় ক্রমশ সবগুলিই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে উপহার দিয়েছি।"

সাহিত্য-পরিষদে এই পুঁথিগুলি সযত্নে রক্ষিত আছে। অবশেষে "১৩১৬ বঙ্গাব্দে কৃষ্ণকীর্তন পুঁথির সন্ধান পাই। ১৩১৮ সনে পরিষদের জন্যে সেটি আহৃত হয়।"

যে ঐশ্বর্য লাভ করার জন্যে তিনি জীবনে আর কিছুই চান নি, জীবনের যাবতীয় সুখ বর্জন করেছিলেন, এবার যেন তাই পেয়ে গেলেন, নবাবিষ্কৃত পুঁথির পাতা উল্টে তিনি দেখলেন তাতে পুরাতন বাংলার হরফে লেখা আছে—

যে কাহ্ন লাগিআঁ মো

আন না চাহিলোঁ

এবার যেন পেয়ে গেলেন সেই কাহ্নকেই এই নূতন কীর্তনের মধ্যে— এই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। ধন্য হয়ে গেল তাঁর জীবন, ধন্য হয়ে গেল বাংলা সাহিত্য।

এনট্রান্স ফেল করে নিয়মে-বাঁধা ছাত্রজীবন শেষ হবার পর তিনি বাড়িতে বসে মৈথিলী-আসামী-ওড়িয়া-বাংলা ইত্যাদি সাহিত্যের আলোচনায় রত থাকেন। অর্থের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল না এতটুকু, অনটনের প্রতি ছিল পরম ঔদাসীন্য। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি উদাসীন থেকে সাহিত্য নিয়ে গবেষণায় তিনি রত থাকেন। তাঁর এই নিষ্ঠা দেখে এবং বঙ্গসাহিত্যের প্রতি এই প্রগাঢ় অনুরাগ দেখে নবদ্বীপের ভুবন-মোহন চতুষ্পাঠী তাঁকে বিদ্বদ্বল্লভ উপাধি দান করেন। সেই থেকে বিদ্বদ্বল্লভ-নামেই সুধীসমাজে বসন্তরঞ্জন পরিচিত

১৮৯৩ সালের জুলাই মাসে কলকাতার গ্রে স্ট্রীটে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব-বাহাদুরের গৃহে বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অব লিটারেচার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য নির্বাচিত হন দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাই। এই বিদ্বৎজন-সভায় প্রবেশের আগ্রহ হয় বিদ্বদ্বল্লভের। কিন্তু তিনি তখন গণ্যও নন এবং তেমন মান্যও নন; সুতরাং তাঁর পক্ষে এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়ার আশা দুরাশা বলেই মনে হল। কেননা, সাধারণত শিক্ষা বলতে যা বোঝায়, তেমন কোনো শিক্ষার ছাপ তাঁর নেই। বসন্তরঞ্জন এখানে প্রবেশের জন্যে আরজি পেশ করলেন। এই আরজিতে তিনি নিজের যোগ্যতার উল্লেখ করলেন না, কেননা, তাঁর নিজের ধারণা, তিনি এখানে প্রবেশের যোগ্য নন। অনিয়মের পথে চলাই তাঁর অভ্যাস, তাই তিনি যোগ্যতার কোনো উল্লেখ না। করে নিজের অযোগ্যতার বিষয়ই উল্লেখ করলেন। কর্তৃপক্ষ এই অযোগ্য ব্যক্তিটির আবেদন মঞ্জুর করলেন, বসন্তরঞ্জন এই অ্যাকাডেমির সদস্যরূপে মনোনীত হলেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪ সাল, বসন্তরঞ্জন অ্যাকাডেমির ২২শ অধিবেশনে সদস্যরূপে উপস্থিত হলেন।

এর কিছুদিন পরেই বাংলার ১৩০১ সনে অ্যাকাডেমির নাম বদল হয়। ইংরেজি নাম রূপান্তরিত হল বাংলা নামে, নাম হল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। পরিষদের সেই জন্মদিন থেকে বসন্তরঞ্জন এর সদস্য। তখনকার কর্তৃপক্ষের উৎসাহে পরিষদে পুঁথিশালার পত্তন হয়— এই পুঁথিশালায় বসন্তরঞ্জনের দান অনেক। এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ দান শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কৃত ও আদৃত হল, এদিকে বসন্তরঞ্জনের আর্থিক অবস্থা তখন ভয়াবহ। তিনি বিপন্ন হয়ে পড়েন এই সময়। তখন তাঁর অবস্থা বিবেচনা করে পরিষৎ তাঁকে মাসিক কিঞ্চিৎ অর্থদানের সিদ্ধান্ত করেন। অর্থ সামান্যই, কিন্তু তাই তিনি সানন্দে গ্রহণ করলেন।

পরিষদের সঙ্গে সম্বন্ধ তাঁর অঙ্গাঙ্গী। যা-কিছু তিনি আহরণ করেন সসম্ভ্রমে তাই এনে দান করেন পরিষদের পুঁথি-ভাণ্ডারে। এতেই তাঁর যেন জীবনের শান্তি এবং এতেই যেন তাঁর সমস্ত পরিশ্রমের পুরস্কার। জীবনকে তিনি উৎসর্গ করে দিয়েছেন পুঁথির মধ্যে এবং পরিষদের মধ্যে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-প্রকাশের পর দেশের ও বিদেশের বহু ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও রসতত্ত্ববিদ্ মনীষী এই গ্রন্থ সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী আলোচনা করতে আরম্ভ করেন। বসন্তরঞ্জন এ আলোচনায় যোগ না দিলেও তাঁর কোনো ক্রটি হত না। কিন্তু তিনি তাঁর নিজের আবিষ্কার সম্বন্ধে এতই সুনিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি উক্ত মনীষীদের সব মন্তব্যের উত্তরদান করেন।

এর পর এল তাঁর আর-একটি জীবন— অধ্যাপনার জীবন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার ক্লাস খোলা হয়েছে। উপযুক্ত অধ্যাপকের জন্য অনুসন্ধান করা হচ্ছে। তখন রামেন্দ্রসুন্দর গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার আশুতোষকে বললেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গ-সরস্বতীর আসন প্রতিষ্ঠা করা হল, যোগ্য পূজারীর সমাদর তাহলে করা আবশ্যক। রামেন্দ্রসুন্দর নাম করলেন বসন্তরঞ্জনের। বসন্তরঞ্জন এ বিষয় বলেছেন, "আমি ইংরেজি জানিনে, এটাই সর্বপ্রথম আলোচিত হয়েছিল। আশুতোষের এক প্রিয়পাত্র এই অভিযোগ করলেন। সেজন্যে আমাকে নানাভাবে যাচাই করা হয়।"

নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে ১৯১৯ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকপদ লাভ করেন। ১৯৩২ সাল পর্যন্ত তিনি এই কাজ যোগ্যতার সঙ্গে করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি আবার পরিষৎ নিয়ে মেতে উঠলেন। পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি ও বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত হলেন।

এই সময় তিনি হাত দিলেন নূতন আর-একটি কাজে— প্রাচীন বঙ্গীয়

শব্দ সংকলনে। তাঁর এই কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে কলকাতার রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯৪৪ সালে তাঁকে সোসাইটির সদস্যরূপে গ্রহণ করলেন।

১৯৪১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সরোজিনী পদক দান করেন।

পুঁথি-সংগ্রহই তাঁর জীবনের প্রধান আকর্ষণ। এই আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে তিনি অগ্রসর হয়ে সাফল্য অর্জন করেছেন। কিন্তু কেন, কিসের জন্য তাঁর মন এদিকে গেল—তার খোঁজ তিনি নিজেও রাখেন না। "যে সময় আমি এসব আরম্ভ করি, তখন কেন, এখনও তা থেকে কোনো অর্থ বা সম্মান পাওয়া যেত না। তোমরা বল যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত কোনো বই এত ভালো করে সম্পাদিত হয়নি। এর চতুর্থ সংস্করণ পুনর্লিখিত ভূমিকায় দেখতে পাবে যে, আমি এখনো আমার মনের মত করতে পারিনি। এখনও আমার অনেক শেখবার আছে। অনেক জানতে বাকি আছে।"

এ কথা কোনো অধ্যাপকের মুখের কথা যেন নয়, কেননা, অধ্যাপকেরা তো সবই জানেন। এ কথা একজন বিদ্যার্থীর মুখের ভাষা। এইজন্যেই তাঁকে অভিনব বিদ্যার্থী বলেই মনে হয়। জ্ঞানের আর অভিজ্ঞতার কি শেষ আছে? যে প্রকৃত জ্ঞানান্বেষী, তার কাছে experience হচ্ছে কেবল একটা arc—একটা দিগন্তবিশেষ, যাকে কোনো দিন ধরা যাবে না, ছোঁয়া যাবে না। সেই দিগন্তের উদ্দেশে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে চলেছিলেন বসন্তরঞ্জন।

সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী
সারঙ্গরঙ্গদা
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ
কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন। অটলবিহারী ঘোষের সহযোগিতায়
হরিলীলা। দীনেশচন্দ্র সেনের সহযোগিতায়

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ভাষা বাংলা ভাষাই। কিন্তু এ ভাষারও পূর্ব-পশ্চিম আছে উত্তর-দক্ষিণ আছে। বাংলা ভাষাতেই এমন শব্দ আছে যা বঙ্গদেশের পূর্ব সীমানায় আবদ্ধ, আবার এমন শব্দও আছে যা পদ্মা নদীর স্রোত ডিঙিয়ে এপার থেকে ওপার যেতে পারে নি। এমনি একটা শব্দ নিয়ে কথা হচ্ছিল ক' দিন আগে আমার এক কবি-বন্ধুর সঙ্গে। তিনি একটি গ্রাম্যছড়া সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু তার 'আজল' কথাটির মানে না বোঝায় তার অর্থটা পরিষ্কার হচ্ছে না—

আজল বলে, কাজল রে ভাই
আমি রাঙা মুখের পান···

তিনি জনকয়েক ভাষাবিদের কাছে এর মানের জন্যে অনুসন্ধান করেছেন, অনেক বইও ঘেঁটেছেন, কিন্তু আসল মানেটা পান নি। তাঁকে কেউ কেউ নাকি পরামর্শ দিয়েছেন এই বলে যে, কথাটি সম্ভবতঃ উজ্জ্বল থেকে এসেছে। কিন্তু এতেও ছড়াটির তেমন কোনো মানে হয় না।

আমি উত্তরবাংলার লোক। আজলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ। উত্তরবাংলার মেয়েমহলে এ কথাটা খুব চালু। ছড়াটি যেদিন আমার চোখে পড়ল সেদিন তৎক্ষণাৎ আমি এর মানে তাই ধরতে পারলাম। আমার মুখে ছড়াটির তারিফ শুনে তিনি বিস্মিত হলেন। তিনি যে এর আগে এইটে নিয়ে এত মুশকিলে পড়েছিলেন জানতাম না। আমি বললাম, 'আজল মানে, ন্যাকা।' আমার কথা শুনে কবি-বন্ধুটি পুলকিত হয়ে উঠলেন, ছড়ার মানে তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি সোৎসাহে একটা মোটা অভিধান খুললেন, ঠিক, তাতে মানে দেওয়া

আছে, কেবল শব্দটির অর্থই নয়, প্রাচীন কবিদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি পর্যন্ত, লেখা আছে—

আজল—'-ল্' বিং [আদরী>আজলী>°ল(?); বৈষ্ণব-সাহিত্যে] ১ আদরিণী, স্নেহপাত্রী। "রাজার কুমারী তুমি আজল কন্যাখানি। কেমনে সহিবা দুঃখ ত্যজি অন্ন পানি॥" —বিষহরি ও পদ্মাবতীর পাঁচালী ৩২৪। ২ [অস আজলা—মূঢ়; আজলমঠ—জানিয়াও না জানার ভাব করা] যে আদরে নেকা সাজে, অর্থাৎ জানিয়াও না জানার ভান করে। "যেহ্ন তেহ্ন লএ নিজ কাজে। হেন সে আজল দেবরাজে॥" শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ২৪৭। —জলি, -জলী বিং, ১ আদরিণী, পাগলী; অগেয়ানী। "দৈবকী-নন্দনে বলে, শুন লো আজলি। তুমি কি না জানো গোরা নাগর বনমালী॥"—নবদ্বীপ-পরিক্রমা ২৮৯। ২ যে নারী জানিয়াও আদরে অবুঝের ভান করে; নেকী। "দেখি তোহ্মাকে আজলী। পর কাজে তোঁ বিকলী॥" শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ২১; আজলী রাধা॰ তোঁ আবালী বড়ী॰ হের পাঞ্জী পরমাণে ৩৭।

এই মোটা বইটি শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষ। এটা মাত্র তার একটি খণ্ড, এমনি আরও চারটে খণ্ড আছে। এতে প্রত্যেকটি শব্দকে তিনি এমনি নিখুঁতভাবে বিচার করেছেন এবং সেই সঙ্গে তার পরিচয় দিয়েছেন।

শান্তিনিকেতনের থমথমে দুপুর। রাঙাপথের দক্ষিণ পার্শ্বে চীনা-ভবন; এর পরে দক্ষিণে সবুজ প্রান্তরের প্রান্তে গুরুপল্লী। সার-সার করোগেট-চালার অনাড়ম্বর গৃহ। এর একটিতে থাকেন শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। গত আষাঢ়ে তাঁর ৮৫ বছর পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

১২৭৪ সনের ১০ই আষাঢ় [খ্রী ১৮৬৭, ২৩ জুন] রবিবার তিনি জন্মগ্রহণ করেন। "বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত যশাইকাটি গ্রামে আমার পৈত্রিক নিবাস, রামনারায়ণপুর গ্রামে আমার মাতুলালয়—এই মাতুলালয়ই আমার জন্মস্থান।"

১৩৫৯ সনের ২১শে আশ্বিন আজ, ১৯৫২ সালের ৭ই অক্টোবর;

বেলা বারোটা বেজেছে। বোলপুর স্টেশন থেকে সাইকেল-রিক্‌শা চেপে সোজা চলে এসেছি। তাঁর বাসা চিনিনে, রিক্‌শাচালক বালকটিও চেনে না। তাই কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরতে হল। প্রাক্‌কুটীরের কাছে বিশ-বাইশ বছরের তিনটি ছেলে ঘুরছিল, সম্ভবত তারা ওখানকার ছাত্র। তাদের জিজ্ঞাসা করলাম। হরিচরণবাবুকে তারা চেনে না। একজন বলল, 'কী রকম দেখতে? মোটা, কালো?' আর একজন বলল, 'তিনি কি ডাক্তার?'

রিক্‌শা ঘুরিয়ে চীনা-ভবনের রাস্তা ধরে চললাম। হরিচরণবাবুর নাম বাইরে হয়তো তেমন প্রচার নেই, কিন্তু স্থানীয় ছাত্রমহলেও তিনি অপরিচিত—ভাবতে ভালো লাগল না।

একটানা পঞ্চাশ বছর তিনি আছেন শান্তিনিকেতনে। "ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩০৮ সনের ৭ই পৌষ। এর মাস-আষ্টেক পর, অর্থাৎ ১৩০৯ সনের শ্রাবণের শেষে আমি আশ্রমে সংস্কৃতের অধ্যাপনায় যোগদান করি।"

অনাড়ম্বর জীবন। চৌকির উপরে বসে তিনি তাঁর জীবনের সংবাদ বলছিলেন। দীর্ঘ ঋজু দেহ। দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে, সারাটা জীবন চোখের কাজ করে আজ অসাড় হয়ে এসেছে চোখ। লেখা-পড়া এখন আর করতে পারেন না, অস্পষ্ট দেখতে পান, লোক চিনতে পারেন—এই মাত্র। বললেন, "আমার জীবনে অসাধারণ কিছুই নাই। আমার জীবনস্মৃতির তাই কিঞ্চিন্মাত্র মূল্য আছে, তা আমি কখনো মনে করতে পারি নি।"

জীবনে অসাধারণ কিছু হয়তো নেই, কিন্তু জীবনে অসাধারণ কাজ তিনি করেছেন, এই জন্যেই জীবন তাঁর অসাধারণতা অর্জন করেছে। একটা জীবনে কতটা ধৈর্যের নিষ্ঠার ও পরিশ্রমের সমবায় ঘটতে পারে, তাঁর জীবনে তার প্রমাণ স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে। সেটি হচ্ছে বঙ্গীয় শব্দকোষ। একাকী তিনি রচনা করেছেন এই বিরাট শব্দকোষ, বাংলা

দেশের উত্তর পূর্ব পশ্চিম দক্ষিণ সব জায়গার গ্রাম্য কথাও তিনি সংগ্রহ করেছেন, তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ তিনি দিয়েছেন, কোন্ কালের কোন্ কবি সেই কথাটি কিভাবে ব্যবহার করেছেন, মধুমক্ষিকার মত তিনি আহরণ করে এনে জমা করেছেন সেইসব ছত্র তাঁর এই শব্দকোষের মৌচাকে।

বললেন, "একচল্লিশ বছর লেগেছে শব্দকোষ সংকলন প্রণয়ন ও মুদ্রাঙ্কণ শেষ করতে; ১৩১২ সনে আরম্ভ করি, শেষ হয় ১৩৫২ সনে। শব্দ-সংকলনের সময় অধ্যাপনার ভার আমার উপর ছিল। ১৩৩৯ সালে (১৯৩২ সনের আগস্ট মাসে) আমি অবসর গ্রহণ করি। অধ্যাপনার সময় ক্লাসে প্রাচীন বাংলা বই নিয়ে বসতাম ও বিশ্রামের সময়ে ক্লাসে বসেই পেন্সিল দিয়ে অভিধানের যোগ্য শব্দ চিহ্নিত ক'রে পরে কার্যাবসানে তা খাতায় লিখতাম। এইরূপে প্রাচীন বাংলা শব্দ সংগ্রহ করে ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত অভিধানের কাজে কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিলাম।"

১৩০৯ সনের শ্রাবণ-শেষে, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাস-আষ্টেক পরে, তিনি যখন সংস্কৃত অধ্যাপকরূপে যোগ দেন, তখন আশ্রমের বালকদের কোনো মুদ্রিত সংস্কৃত পাঠ্যগ্রন্থ ছিল না। গৃহের বালক-বালিকাদের সংস্কৃত শিক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ একটি সংস্কৃত পাঠ লিখতে আরম্ভ করেন, এতে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ব্যাকরণ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বললেন, "এইরূপ প্রণালীতে লিখিত একটি পাণ্ডুলিপি দিয়ে কবি তদনুসারে একটা সংস্কৃত পাঠ্য লিখতে আমাকে বলেন। তাঁর নির্দেশ অনুসারে সংস্কৃত-প্রবেশ রচনা করে তিন খণ্ডে সমাপ্ত করি। এই পাঠ্যপুস্তক রচনার সময়ই একদিন কবি কথাপ্রসঙ্গে বাংলায় একখানি ভালো অভিধান প্রণয়নের কথা বলেন। তাঁর সেই ইচ্ছা অনুসারেই অভিধান-রচনায় নিরত হই। শব্দকোষ প্রণয়নের মূল কারণ এই। তখন ১৩১২ সাল।"

একটু থেমে আক্ষেপের স্বরে বললেন, "কিন্তু কবি এই গ্রন্থটি শেষ দেখে যেতে পারলেন না। তাঁর মহাপ্রয়াণেরও বছর-চার পরে গ্রন্থটি প্রণয়ন ও মুদ্রাঙ্কণ শেষ হয়।"

সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরে তাঁর জন্ম। সংসারে অর্থকৃচ্ছ্রতা ছিল। পিতা নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারীতে কাজ করতেন। রামনারায়ণপুর গ্রামে তিনি মাতুলালয়েই ছিলেন চার বৎসর বয়স পর্যন্ত। এই সময় তিনি তাঁর মাতার সঙ্গে যশাইকাটির বাড়ীতে আসেন। বাটীব নিকটে একটি ছোট বাংলা বিদ্যালয় ছিল, এখানেই তাঁর বিদ্যারম্ভ। আট-নয় বৎসর বয়সে পুনরায় মাতুলালয়ে যান। মামাতো ভাইদের সঙ্গে বসিরহাট মাইনর স্কুলে পড়তে আরম্ভ করেন। মাইনর স্কুল হাই স্কুলে পরিণত হয়। এখানে তিনি পড়েন পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। তার পর তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে। ইংরেজি শিক্ষা ত্যাগ করে মধ্যবাংলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থে একটি বাংলা স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই সময় পরীক্ষার ফল আশানুরূপ না হওয়ায় প্রধান শিক্ষক মহাশয় তিরস্কার করেন। তিরস্কারের ভাষা কঠোর ও অসহনীয় হয়, তাঁর পিতা এই কারণে তাঁকে তাঁর মাতুলালয়ের নিকটবর্তী একটি বাংলা স্কুলে ভর্তি করে দেন। এই স্কুল থেকে তিনি উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করে এক বছরের জন্যে কিছু বৃত্তি পান। এতে তাঁর পড়ার ব্যয় নির্বাহ হয়। পরের বছর মধ্যবাংলা পরীক্ষায় পাশ করেন। তারপর ফিরে আসেন যশাইকাটির পিতৃগৃহে। এখানে এসে বাদুড়িয়া লণ্ডন মিশনারী স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই সময়ে শ্রীশচন্দ্র দত্ত নামে একজন সহপাঠীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। এখানে প্রায় দুই বৎসর পড়ার পর বিদ্যালয়-গৃহটি আগুনে বিনষ্ট হলে আড়বেলিয়া ও ধান্যকুড়িয়ায় দুইটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে আড়বেলিয়ায় ও পরে ধান্যকুড়িয়ার ইস্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত তিনি পড়েন। এই সময়ে গ্রীষ্মাবকাশে কলকাতার

পথে গাড়ীতে বাদুড়িয়ার শশিভূষণ দাস নামে একটি যুবকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁর বন্ধু শ্রীশের সঙ্গে শশীর পূর্বেই পরিচয় ছিল। শ্রীশের মুখে শশীও তাঁর পরিচয় পেয়েছিল। এই সূত্রে শশীর সঙ্গে তাঁর বেশ পরিচয় হল। শশী কলকাতার জেনারেল অ্যাসেম্বলীর দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ত। সে বলল, 'তুমি এই স্কুলে আমার সঙ্গে পড়।' অর্থাভাবের কথা জানালে সে বলল, 'সাহেবরা বড় দয়ালু ও সহৃদয়, বেতনের ব্যবস্থা পরে হবে।' এ কথা শুনে তিনি আর আপত্তি করলেন না, শশীর সঙ্গে ক্লাসে যোগ দিলেন। কালীনাথ মিত্র নামে এই স্কুলে একজন শিক্ষক ছিলেন। স্কুলের কাজে তাঁর বিশেষ প্রভাব ছিল, তিনি শশীকে ভালোবাসতেন। তাঁকে শশী এ বিষয় জানালে তিনি বললেন, 'আগামী পরীক্ষার ফল দেখে ব্যবস্থা করবো।' দ্বিতীয় শ্রেণীতে তখন ছাত্রসংখ্যা ৮০। এত ছাত্রের মধ্যে তাঁর পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে বলে তিনি মনে করতেই পারেননি; কিন্তু একেবারে নিরাশও হননি। পরীক্ষার সময় এল, পরীক্ষাও দিলেন, কিন্তু ফল জানার জন্য তাঁর কিছুমাত্র ঔৎসুক্য ছিল না; কারণ, কি জানি শশী কি অপ্রীতিকর কথাই না শোনাবে। এই-ভাবে কিছুকাল কাটলে, পরীক্ষার ফল অনুসারে প্রমোশনও হল, তিনি শশীর সঙ্গে এক ক্লাসে গিয়ে বসলেন। শিক্ষক রেজিস্টার খুলে রোল-কল আরম্ভ করলেন, তখন দেখলেন রেজিস্টারে তাঁর নাম লেখা হয়েছে। শশীকে প্রমোশনের কথা জিজ্ঞাসা করলে সে তাঁকে বলল, 'তুমি জানোনা? পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের তালিকায় তুমি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছ। বিনাবেতনে পড়ার আদেশ কর্তৃপক্ষ তোমাকে দিয়েছেন।' এইরূপে তাঁর বেতনের সমস্যা নিরাকৃত হল।

পরের বছর প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে কলেজে পড়তে আরম্ভ করেন। কিন্তু এখানেও পুনরায় বেতনের প্রশ্নে তিনি চিন্তিত হলেন। এই সময়

এক বন্ধু পরামর্শ দিলেন যে, পটলডাঙার মল্লিকপরিবারের ফণ্ড থেকে মেট্রোপলিটন কলেজে (বিদ্যাসাগর কলেজে) কয়েকটি ছাত্রকে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, সেখানে যেন তিনি দরখাস্ত করেন। তিনি যখন তাঁর দেশের স্কুলে পড়তেন, তখন রবীন্দ্রনাথ এক বছর তাঁকে বৃত্তি দিয়েছিলেন, এই কথা তাঁকে জানালে তিনি বাংলায় একটি সার্টিফিকেট লিখে দেন। মল্লিক ফণ্ডের সভাপতি ছিলেন ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করে সার্টিফিকেট-সহ দরখাস্ত হাতে দিতেই তিনি রবীন্দ্রনাথের সার্টিফিকেট দেখে প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন ও ফণ্ডের সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করে হাতে দরখাস্ত দিলে তিনি মেট্রোপলিটন কলেজের প্রিন্সিপালের নামে চিঠি দিলেন। কলেজে এসে অধ্যক্ষের হাতে চিঠি দিলে তিনি কলেজের প্রথম শ্রেণীর রেজিস্টারে তাঁর নাম লেখার আদেশ দিলেন। এতে তিনি মেট্রোপলিটনে ভর্তির অনুমতি পেলেন। ফণ্ড থেকে নিয়মিত বেতন পেয়ে তিনি এফ. এ. পাশ করে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। কলেজের মাইনে লাগত না, কিন্তু বই কেনা ইত্যাদি সমস্যা রয়েই গেল। দুই-একজন ছাত্র পড়িয়ে কিছু অর্থাগম হত, তা দিয়ে পাঠ্য বই কিনতেন। তৃতীয় বার্ষিক বি. এ. ক্লাসে পড়ার সময় গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি দেশে যান। ছুটির পরে দেশ থেকে ফিরতে বিলম্ব হওয়ায় ফণ্ড থেকে তাঁর বেতন দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল, অনুপাস্থিতির কারণও তিনি জানালেন কিন্তু গ্রাহ্য হল না।

বললেন, "তখন নৈরাশ্যে আমার মনের অবস্থা কিরূপ হয়েছিল তা অনুমেয়ই, কথায় ব্যক্ত করা কঠিন। আমার কলেজে পড়া বন্ধ হয়ে গেল।"

অনেক বাধাবিপত্তি ডিঙিয়ে যে স্রোত বয়ে চলেছিল, হঠাৎ সেই স্রোত চোরাবালির নীচে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ছাত্র-জীবন শেষ হয়ে গেল শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

কর্মহীন অলস জীবন শুরু হল তাঁর। কিন্তু নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকা তাঁর প্রকৃতি নয়। বললেন, "এই সময় অধ্যাত্ম রামায়ণের বঙ্গভাষায় পদ্যে অনুবাদ আরম্ভ করলাম। প্রায় দুই বছরে অনুবাদ শেষ করি। পাণ্ডুলিপি অবস্থায় এখনো তা আমার কাছে আছে।"

এই সময় তিনি বাড়ী যান ও দেশের দুটি হাই স্কুলে প্রায় তিন বছর শিক্ষকের কাজ করেন। ১৩০৬ সনে একবার কলকাতায় আসেন। কিছুদিন পরে মেদিনীপুরের অন্তর্গত নাড়াজোলের রাজবাটীতে কুমার দেবেন্দ্রলাল খানের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৩০৮ সনে পূজার ছুটিতে বাড়ীতে আসেন। "অতি দূর দেশে স্বল্প বেতনে চাকরী করা আমার পিতার অভিমত হল না। তিনি যেতে নিষেধ করলেন। আমি রাজাকে পদত্যাগ জানালাম।"

এই সময় কলকাতায় টাউন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি এই স্কুলে প্রথম প্রধানপণ্ডিত নিযুক্ত হন। এই বছর চৈত্র মাসে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। সংসারের ভার পড়ে তাঁর উপর। কনিষ্ঠ ভ্রাতা তারাচরণের উপর সংসারের পরিচালনার ভার দিয়ে তিনি কলকাতায় আসেন ও টাউন স্কুলের কাজ পরিত্যাগ করেন।

তাঁর পিসতুতো দাদা যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সদরে খাজাঞ্চি ছিলেন। তিনি রোজ বিকেলে তাঁর দাদার আপিসে যেতেন। বললেন, "শান্তিনিকেতনে তখন কবির ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমার দাদার কাছে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপকদের অধ্যাপনার বিষয় ও আশ্রমে সুখে বসবাসের কথা শুনতাম। আমার বিদ্যা স্বল্পই, এই আশ্রমে অধ্যাপনার কথা আমি চিন্তা করতেই পারিনি।"

তাঁর দাদা রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর বিষয় বলেন। এক সময় রবীন্দ্রনাথ যে তাঁকে বৃত্তি দিয়েছিলেন, তাও উল্লেখ করেন। এবং একটি কাজ দেবার

কথা বলেন। "এই প্রার্থনানুসারে কবি রাজসাহীর অন্তর্গত কালীগ্রামের জমিদারী কাছারি পতিশরে আমাকে সুপারিনটেনডেণ্টের পদে নিযুক্ত করেন।"

১৩০৯ সনের শ্রাবণের প্রথমে তিনি পতিশরে গিয়ে কাজে যোগ দেন। এই সময় কবির উপরে জমিদারি পর্যবেক্ষণের ভার ছিল। একদিন তাঁরা শুনলেন কবি সেই দিনই শিলাইদহ্ থেকে বোটে পতিশরে আসবেন। "এই সময় পতিশরের চারদিকে দিগন্তবিস্তৃত বিপুল ধানক্ষেত জলে প্লাবিত, ধানের শীর্ষগুলি মাত্র দেখা যাচ্ছে। তারই অনতিদূরে কবির বোটের মাস্তুল দেখা গেল। কাছারির ম্যানেজার কর্মচারী প্রভৃতি কবির সঙ্গে দেখা করার জন্য সজ্জিত হলেন, বোট কাছারির ঘাটে লাগলে সকলে কবির সঙ্গে দেখা করার জন্যে চললেন, সঙ্গেসঙ্গে আমিও গেলাম। তাঁর সঙ্গে দেখা করে বাসায় ফিরে এলাম।"

তিনি বাসায় এসে পৌঁছেছেন তার কিছুক্ষণ বাদেই কবির কাছ থেকে লোক এসে খবর দিল কবি তাঁকে ডাকছেন। বললেন, "আমি এই আহ্বানের সংবাদে বিস্মিত হলাম। ভাবলাম, আমি নতুন লোক, আমাকে তিনি ডাকলেন কেন।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি গিয়ে বোটে দেখা করলেন। রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এখানে দিনে কি কাজ করো?

"বললাম, দিনে জমিদারী জরিপের চিঠা নিয়ে আমিনের সঙ্গে কাজ করি। কবি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, রাত্রে কি কর? তার উত্তরে বললাম—সন্ধ্যার পরে সংস্কৃতের আলোচনা করি, আর ইংরেজি থেকে সংস্কৃত অনুবাদের পাণ্ডুলিপির প্রেস-কপি প্রস্তুত করি। অনুবাদ পুস্তকের কথা শুনে কবি পাণ্ডুলিপি দেখতে চাইলেন। আমি তাঁকে দেখালাম। তিনি দেখলেন, কোনো মন্তব্য করলেন না।"

এর পরই তাঁর ডাক এল শান্তিনিকেতন থেকে। রবীন্দ্রনাথ পতিশরের ম্যানেজার শৈলেশচন্দ্র মজুমদারকে জানালেন, 'শৈলেশ, তোমার সংস্কৃতজ্ঞ কর্মচারীকে এখানে পাঠিয়ে দাও।' এ-সংবাদে তিনি আনন্দিত হলেন। কেননা, অধ্যাপনাই তাঁর প্রকৃতির অনুরূপ কাজ। সাংসারিক দায়িত্বভার তাঁর উপর পড়ায় বাধ্য হয়ে তাঁকে পতিশরের কাজ গ্রহণ করতে হয়েছিল।

বললেন, "আমি তখনই প্রস্তুত হলাম। নৌকোয় করে আত্রাই স্টেশনে এসে সেই দিন রাত্রে কলকাতায় পৌঁছলাম। পরদিন সকালে সাড়ে সাতটার ট্রেনে শান্তিনিকেতনে কবির নিকট উপস্থিত হলাম। ১৩০৯ সনের শ্রাবণের তখন শেষাশেষি সময়।"

আজ ১৩৫৯ সনের আশ্বিনের শেষাশেষি। পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গিয়েছে। বাইরে শান্তিনিকেতনের রাঙামাটির পথ ও আকাশ-ছোঁয়া প্রান্তরের দিকে চেয়ে পঞ্চাশ বছর আগের এই মাঠ আর এই পথের কথা ভাবছিলাম। আকাশে মেঘ করে এসেছে, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। করগেটের চালের উপর বৃষ্টির নূপুর বাজছে। আর, মনে হচ্ছে সেই তালে তালে বাইরের গাছের ডালপালা যেন ঈষৎ আন্দোলিত হচ্ছে। আজ যাঁর বয়স ৮৫, তখন তিনি ছিলেন ৩৫। আজ যিনি বার্ধক্যে শ্লথ, সেদিন তিনি ছিলেন যৌবনের উদ্দীপনায় প্রাণবন্ত। তাঁর যে-চোখের সামনে পঞ্চাশ বছরের শান্তিনিকেতন গড়ে উঠেছে, আজ সেই চোখ নির্জীব ও নিষ্প্রভ। একটি সুবৃহৎ অভিধান-প্রণয়নে তিনি কেবল তাঁর জীবনই উৎসর্গ করেন নি, তাঁর চোখ দুটিও যেন উৎসর্গ করে দিয়েছেন।

তাঁর গৃহের এক পাশে থাকেন পণ্ডিত সুখময় শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ, আর এক পাশে শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী। মনোমত প্রতিবেশী নিয়ে রচিত হয়েছে এই গুরুপল্লী। সকলের সঙ্গে সকলের মনের একটা যোগ আছে।

এঁদের দুজনের সঙ্গেও দেখা হল। হরিচরণবাবুর জীবন-কথা লেখা হচ্ছে জেনে এঁরা উল্লসিত হলেন, আনন্দিত হলেন এবং উৎসাহ দিলেন।

এঁদের সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় মেঘ ছিঁড়ে একটু রোদ্ দেখা দিতেই বারান্দায় একটা মোড়া এনে বসতে বললাম হরিচরণবাবুকে। তাঁর কয়েকটা ছবি তুলে নিলাম। বললাম, "আমি কাঁচা ক্যামেরাম্যান। ছবি উঠল কি না জানি নে।"

তিনি হাসলেন, বললেন, "পুরনো ছবি আছে। যদি তাতে কাজ হয়, দিতে পারি।"

কিন্তু ছবি আমার আসল কাজ নয়, আসল কাজ কথা। তাই ঘরের ভিতর গিয়ে আরম্ভ হল সেই কথাই।

বললেন, "অভিধানের পাণ্ডুলিপি কিছুটা অগ্রসর হলে ১৩১৮ সনের আষাঢ় মাসে আমাকে কোনো কারণে কলকাতায় থাকতে হয়। এই সময়ে সেন্ট্রাল কলেজে কিছুদিন সংস্কৃত অধ্যাপকের কার্য করি। তখন অভিধানের কাজ কিছুদিন একেবারেই বন্ধ থাকে। অভীষ্ট বিষয়ের ব্যাঘাত জন্য বেদনা সুতীব্র ও মর্মস্পর্শী হলেও আমার এই দুঃখ নিবেদনের স্থান আর কোথাও ছিল না, কেবল অবসর মত মধ্যে মধ্যে জোড়াসাঁকোর বাটীতে কবিবরের নিকটে গিয়ে মনের বেদনার গুরুভার কিঞ্চিত লাঘব করে আসতাম। সহৃদয় মহাত্মার কাছে কোনো সদ্বিষয়ের নিবেদন কখনোই ব্যর্থ হয় না, আমার দুঃখের নিবেদন সার্থক হল। কবিবর বিদ্যোৎসাহী দানশীল মহারাজ শ্রীযুত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সহিত দেখা করে অভিধানের বিষয় জানালেন ও বৃত্তির কথা উত্থাপন করলেন। তদনুসারে মহারাজও মাসিক ৫০৲ টাকা বৃত্তি দিবেন স্বীকার করেন। এইরূপে আমার অর্থ-সমস্যার কিঞ্চিত সমাধান হল, কবিবর দেখা করার নিমিত্ত আমাকে সংবাদ দিলেন। আমি দেখা করতে গিয়ে তাঁর মুখে বৃত্তির

সংবাদ শুনলাম। আমি সর্বপ্রকারেই নগণ্য, আমারই নিমিত্ত কবিবরের যাচকবৃত্তি, এ কথা চিন্তা করতে করতে আমি তাঁর চরিত্রের মহত্ত্বে ও কর্তব্যকর্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় অভিভূত হয়ে পড়লাম—আমার আকার-প্রকার ও মৌনভাব আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। আমার হৃদয়গত ভাব বুঝে কবিবর ধীর কণ্ঠে বললেন—স্থির হও, আমি কর্তব্যই করেছি।—এই বৃত্তি তের বৎসর ধরে পাই।"

অভিধানের পাণ্ডুলিপির কাজ শেষ হয় ১৩৩০ সনে। তারপর প্রায় ছয় বছর যায় কিয়দংশ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে। বিশ্বভারতী থেকেই অভিধানটি প্রকাশ করার ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথের ছিল, কিন্তু এত বড় বই মুদ্রণের ভার গ্রহণ করা তখন বিশ্বভারতীর সামর্থ্য ছিল না। এই কারণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশের চেষ্টা হয়। কথাও প্রায় পাকাপাকি হয়ে এসেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশে বিশ্ববিদ্যালয় সাহসী হলেন না। এর পর তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রকাশের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁদেরও আর্থিক অবস্থা ভালো নয়।

বললেন, "প্রকাশের বিষয় এই ভাবে বিফল হয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলাম।"

এর পর প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর উদ্যোগে ১৩৩৯ সনের আষাঢ়ে অভিধান মুদ্রণ আরম্ভ হয়, প্রায় অর্ধেক মুদ্রিত হওয়ার পর অকস্মাৎ বসু মহাশয়ের মৃত্যু ঘটে, মুদ্রাঙ্কণও বন্ধ হয়ে যায়।

"বিশ্বকোষের প্রধান কম্পোজিটর মন্মথনাথ মতিলাল এই বিপদে আমার বিশেষ সহায়ক হয়েছিলেন। মন্মথবাবু অপর একটি প্রেসের সঙ্গে কথা বলে নিজেই একা কম্পোজ করে অভিধান মুদ্রণ শেষ করেন। এইভাবে ১৩৫২ সনে ভগবৎ-অনুগ্রহে ১০৫ খণ্ডে অভিধান-মুদ্রণ সমাপ্ত হয়।"

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী যখন তাঁকে বৃত্তি দেন, তখন রবীন্দ্রনাথের একটি কথার উল্লেখ ক'রে তিনি বললেন, "আমার জীবন সম্বন্ধে কবির ভবিষ্যৎ বাণীর কথা আজ মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন—মহারাজের বৃত্তিদান ভগবানের অভিপ্রেত, অভিধানের সমাপ্তির পূর্বে তোমার জীবন-নাশের শঙ্কা নাই।—তাই হয়তো এখনো আমি জীবিত আছি। তাঁর কথা সত্য হল বটে, কিন্তু বিশেষ দুঃখের বিষয় যে, অভিধানের উদ্ভাবক কবি আজ স্বর্গগত, তাঁর হাতে এর শেষ খণ্ড অর্পণ করতে পারি নি। সাংবাদিক-শিরোমণি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অভিধানের বিষয় আমার বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি যখনই আশ্রমে এসেছেন আমার কাছে গিয়ে অভিধানের কার্য নির্বিঘ্নে অগ্রসর হওয়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করেছেন। কোষের সর্বাঙ্গ সৌষ্ঠব বিষয়েও সৎপরামর্শ দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছিলেন, অভিধানের সমাপ্তিতে এবিষয়ে কিছু লিখব। প্রবাসী-সম্পাদক এখন পরলোকে প্রবাসী। কোষ সমাপ্তিও তাঁকে দেখাতে পারলাম না, তাঁর লেখাও হল না। মণীন্দ্রচন্দ্রও তো মুদ্রাঙ্কণের পূর্বেই অস্তমিত। অভিধানের বিষয়ে এই তিনটি আমার বিষম বিষাদের বিষয় হয়ে রইল।"

অভিধান-রচনার ন্যায় দুরূহ কাজ তিনি করেছেন। তাঁর জীবনের ৪১টি বছর তিনি ব্যয় করেছেন এই কাজে। অনেকে এ-কাজকে নীরস কাজ বলেন। নীরস যদি এ-কাজ হয়েও থাকে, তবু তার মধ্যে থেকেও তাঁর সরস চিত্তের পরিচয় দেখা দিয়েছে মাঝে মাঝে।—ম্যাথু আর্নল্ডের 'শোরাব রুস্তম' তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে অনুবাদ করেছেন, ১৩১৬ সনে অর্চনা পত্রিকায় তা মুদ্রিত হয়েছে; আর-একটি হচ্ছে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত খণ্ডকাব্য 'বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র', ১৩১৭-১৮ সনে ব্রাহ্মণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে; এ ছাড়া আছে প্রথম-জীবনে রচিত অধ্যাত্ম রামায়ণের পদ্যানুবাদ

'কবিকথা-মঞ্জুষিকা' নাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথের উপর লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ —দেশ, যুগান্তর ও মাতৃভূমিতে প্রকাশিত; রামরাজত্বের বিশদ ব্যাখ্যামূলক প্রবন্ধ 'রাজ্য ও রামরাজত্ব'—গান্ধীজির মৃত্যুদিবস উপলক্ষ্যে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত; 'সত্যনারায়ণ লীলা'—বিশ্বভারতীর বাংলা গবেষণা বিভাগের উপাধ্যায় শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল প্রকাশিত প্রথম খণ্ড পুঁথি-পরিচয়ে এর পরিচয় আছে; 'রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মচর্যাশ্রম'—আশ্রমের প্রথম দিকের কথা; এ ছাড়া প্রকীর্ণ প্রবন্ধ—অবতারবাদ, জন্মান্তরবাদ, দ্যুতক্রীড়া প্রভৃতি। এগুলি তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বললেন, "কোনো উৎসাহী প্রকাশক যদি এগুলি ছাপার ভার গ্রহণ করেন তাহলে জীবনের শেষ কটা দিন পরম পরিতোষ লাভ করি।"

১৩০৯ থেকে ১৩৩৯ সন পর্যন্ত পণ্ডিত হরিচরণ বিশ্বভারতী শিক্ষাভবনের প্রধানসংস্কৃত অধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে সরোজিনী স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করেন।

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের ছাত্রগণ ১৩৫১ সনের নববর্ষের প্রথম দিনে এঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন, পর বৎসর ১৩৫২ সনের ফাল্গুন মাসে বিচারপাত ব্রজকান্ত গুহ মহাশয়ের গৃহে দ্বিতীয় সম্বর্ধনা সভার অধিবেশন হয়। তারপর ১৩৫৩ সনে কবির জন্মোৎসব দিবসে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ এঁর কঠোর পরিশ্রমের মূল্যস্বরূপ এক হাজার টাকার তোড়া দিয়ে আম্রকুঞ্জে এঁর সম্বর্ধনা করেন। বললেন, "আমার একটা শেষ কথা আছে। একদিন সকালে উত্তরায়ণে কবির সঙ্গে দেখা করতে যাই। অভিধানের কথা জিজ্ঞাসা করে কবি বললেন যে, আমাদের বঙ্গীয় প্রাদেশিক শব্দকোষ নাই, এটাও করা দরকার। আমি তাঁকে বলি যে, অভিধান শেষ করে যদি শক্তি থাকে তা হলে আপনার ইচ্ছা পূরণ করব। আজ

অভিধান শেষ হয়েছে, দেহ এখন জরাজীর্ণ, গ্রন্থি শিথিল, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। যদি এই কাজ আরম্ভ করে যেতে পারতাম তা হলে তাঁর ইচ্ছা আংশিক পূরণ হত, আমিও শান্তিলাভ করতে পারতাম। কিন্তু এখন তার সম্ভাবনা দেখি না।"

বাইরে সাইকেল-রিক্‌শার হর্ন বেজে উঠল। ট্রেনের সময় বুঝি হয়ে এসেছে। তারই তাগিদের সংকেত ওটা। বিদায় নিয়ে উঠে পড়লাম। বয়সে আর বিনয়ে নম্র হয়ে দাঁড়ালেন শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পদধূলি নিয়ে রওনা হলাম।

ঘাসের জমিটুকু পার হয়ে রাস্তায় উঠে পড়ল রিক্‌শা। পিছনে গুরুপল্লী রেখে রাস্তার রাঙা ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলল ত্রিচক্রযান। চারদিকে নিঃসঙ্গ গাছপালা, মাঝখানে নির্জন রাস্তা। সোজা চলে গিয়েছে সদর সড়ক পর্যন্ত। শান্তিনিকেতনের মাঠে মেঘ চুইয়ে ধীরে ধীরে বিকেল নামছে।

রচিত গ্রন্থাবলী

বঙ্গীয় শব্দকোষ। ৫ খণ্ড

রবীন্দ্রনাথের কথা

সংস্কৃত-প্রবেশ। ৩ ভাগ

ব্যাকরণ কৌমুদী। ৪ ভাগ

Hints on Sanskrit Composition & Translation

পালিপ্রবেশ। শব্দানুশাসন

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

কিছুদিন আগেও এ-অঞ্চলটা ছিল অনেক শান্ত। গড়িয়াহাট রোড। এই রাস্তা দিয়ে গড়িয়ার হাটে যেত লোকজন আর গোরুর গাড়ি। গড়িয়ার হাট থেকে এই রাস্তা ধরেই গোরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে তরিতরকারি শাকসব্জি ফলফুলুড়ি কলকাতার বাজারে-বাজারে চালান হত। ভোর রাত্রের দিকে অন্ধকার ভেদ করে মন্থর গতিতে চাকায় মৃদু আর্তনাদ বাজিয়ে গোরুর গাড়ি চলত এই রাস্তায়।

কিন্তু গড়িয়াহাট রোডের সে দিন এখন নেই। সে অনাড়ম্বর মন্থর জীবন ভুলে গেছে সে। এখন ব্যস্ততায় ও ত্রস্ততায় গড়িয়াহাট সরগরম। ভারি ভারি গাড়ি চলাচল করছে অনবরত দ্রুতগতিতে; কাতারে কাতারে দোকানপাট বসে গেছে রাস্তার দুপাশে। এক পাশে সার-সার কাঠের গোলা; আর একদিকে মনোহারি ও পানবিড়ি সিগরেটের দোকান ও রেস্টুরেণ্ট। অদূরে রেল-লাইন—অনবরত ভারি মালগাড়ির শাণিত হুইসল বেজে চলেছে।

এত ভিড় ও হৈ-হাঙ্গামার এক পাশে বটগাছের ছায়ার আড়ালে, দেখে ভালো লাগল, একটা বইয়ের দোকান। দোকানের গায়ে বড় বড় হরফে বিজ্ঞাপন লেখা—অমুকচন্দ্র অমুকের অনুবাদ অন্বয় ও টীকাসহ গীতা।

দোকানের গা ঘেঁষে কয়েক পা এগিয়েই 'ব্রহ্মবিহার'। শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য শাস্ত্রী এখানে থাকেন।

দেয়ালের পাশ দিয়ে সরু পথ। পথের শেষে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠেই পেয়ে গেলাম একটা নিভৃত পরিবেশ। অতি নিকটের রাস্তায় ব্যস্ততার যে

দৌরাত্ম্য চলেছে, এখানে পৌঁছেই তার কথা মুছে গেল মন থেকে। ছাদ সমান উঁচু আলমারি ভরা বই, মেঝেতে মাদুর বিছানো, এক কোণে একটি ডেস্ক। ডেস্কের সামনে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বসে তিনি লেখাপড়া করছেন।

১৩৫৯ সনের ১৫ই আশ্বিন আজ, ১৯৫২ সালের ১লা অক্টোবর। বেলা আড়াইটে। বাইরে প্রখর রোদ। সেই রোদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখন রাস্তায় ভারি ভারি গাড়ি ছুটোছুটি করছে। কিন্তু এই ঘরটিতে পৌঁছেই যেমন মন থেকে ব্যস্ততার ছবিটা মুছে গেল, রোদের ঝাঁঝের কথাও ভুলে গেলাম সেইসঙ্গে। বইয়ের দেয়াল দিয়েই যেন এ ঘরটি তৈরি। বাইরে থেকে কোনো দৌরাত্ম্য বা কোনো উপদ্রব যাতে এখানে এসে পৌঁছতে না পারে, তারই জন্যে হয়তো তাঁর এই ব্যূহ রচনা। প্রকৃতপক্ষে সেই রকম বলেই মনে হল। সমস্ত রকমের কলরব আর কোলাহল উপেক্ষা করে তিনি একান্ত মনে এখানে বসে যেন আরাধনায় রত।

আজকার কথা নয়, চুয়াত্তর বছর আগে তিনি পদার্পণ করেছেন পৃথিবীতে। ১২৮৫ সনের ২৫শে আশ্বিন [১৮৭৮ সালের ১০ই অকটোবর] শুক্রবার। মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামে।

আগের থেকেই তাঁর সঙ্গে দিন ও সময় নির্দিষ্ট করা ছিল। এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের হেতুও জানানো ছিল।

আজ তিনি আমাকে দেখেই বললেন, "মনীষী? আমি ওর মধ্যে কেন?"

কেনর জবাব দেওয়া কঠিন। তাই ঘুরিয়ে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হল; ইচ্ছে হল যে, বলি, কেন তিনি মনীষী নন এইটুকুই প্রমাণ করে দিন্। বললাম, "নিজেকে আপনি মনীষী মনে না করলেও পাঁচজনে যখন করে, তখন তা মেনে নিতে হবে আপনাকে।"

হাসলেন, সরস ও স্বচ্ছন্দ হাসি। সে হাসি অবিকল শিশুর মুখের হাসির মতই মনে হল, মনে হল তেমনি অকপট এবং তেমনি অনাবিল।

অতি ক্ষুদ্রাকার মানুষটি, মুখ-ভরা শ্বেত শ্মশ্রু। অনাবৃত গায়ে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বসে বললেন, "তোমাদের উদ্দেশ্যটা ভালো। কিন্তু এতে ক্ষতিরও সম্ভাবনা আছে।"

এমন দেখা গিয়েছে যে, পাঁচজনে যাঁকে শ্রদ্ধা করে, আরও দশজন তা দেখাদেখি তাঁকে শ্রদ্ধা করে; কিন্তু কেন করে, তা আদপে জানেই না; বিশেষ কোনো ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করাটা একটা নিয়ম বলে তারা মেনে নেয়। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে—শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি কি জন্যে শ্রদ্ধেয় এবং জীবনে কি কি করেছেন বলে শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছেন, এই খবর সকলকে জানিয়ে দেওয়া। এর দ্বারা ক্ষতিরও সম্ভাবনা আছে শুনে সামান্য শঙ্কিতই হলাম। আমার মুখে আশঙ্কার ছায়া ফুটে উঠে থাকবে।

তিনি হেসে বললেন, "সংস্কৃতে এ বিষয়ে একটা শ্লোক আছে—

ফলং বৈ কদলীং হন্তি
 ফলং বেণুং ফলং নডম্।
সংকারঃ কাপুরুষং হন্তি
 স্বগর্ভোঽশ্বতরীং যথা॥

কলা গাছে ফুল ফুটলে বা ফল ধরলে সে গাছ যায় ম'রে, বাঁশের ঝাড়ে ফল ধরলেও তা হয় নির্বংশ, নলখাগড়ায় ফল ফললেও তার প্রাণ যায়, অশ্বতরীর শাবক হলেই সে মারা পড়ে; কাপুরুষেরও হয় সেই দশা—তার কোনো সৎকাজ করলে, অর্থাৎ স্তুতি-প্রশংসা-সম্মান করলে, তার পতন ঘটে। কেননা, তার ছাতি ফুলে ওঠে, সে ভাবে, আমি কী-একটা হয়ে গেলাম।"

একটু থেমে আবার হাসলেন, বললেন, "ভাবছি, তোমাদের এই কাজে আমার বা অন্য কারো কোনো ক্ষতি হয়ে না যায়।"

এর কোনো উত্তর হয় না। তাঁর সঙ্গে হাসিতে আমিও যোগ দিলাম, বললাম, "কারো ক্ষতি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, তাই যাদের ক্ষতি হবার

সম্ভাবনা আছে, তাদের ক্ষতি করতে কখনো তাদের কাছে যাব না। আমার তালিকায় তাদের নামই তাই রাখি নি।”

জবাব শুনে শাস্ত্রী মহাশয় হাসলেন, বললেন, “বেশ, এবার তোমার জিজ্ঞাস্য কি বল।”

জিজ্ঞাস্য বিশেষ কিছুই নেই। যাঁরা তাঁদের সুদীর্ঘ জীবন অধ্যয়নে আর অধ্যাপনায়, সাধনায় ও আরাধনায় কাটিয়েছেন, তাঁদের জীবনের কাহিনী তাঁদের মুখ থেকে শুনে বেড়াচ্ছি এবং হুবহু তাই লিপিবদ্ধ করে রাখছি।

বললেন, “আমার পিতামহ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও সাধক ছিলেন। কাশীতে পণ্ডিত মহলে তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল,পণ্ডিতবর্গ তাঁকে আগমচূড়ামণি বলে সম্বোধন করতেন। আমার জন্মের বছর পাঁচ আগে ১২৮০ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি হরিশ্চন্দ্রপুরে নিজের বাটীতে ত্রিশক্তি স্থাপনা করেছিলেন। তখন রেল-ইস্টিমার ছিল না, কাশী থেকে নৌকোতে ক'রে তিনি স্বগ্রামে এই ত্রিশক্তি আনেন। পিতামহের কয়েক ঘর শিষ্য ছিল। আমার পিতার নাম শ্রীত্রৈলোক্য-নাথ ভট্টাচায, তিনিও কিছুদিন শিষ্য-পালন করেছেন, আমি সে ধারা রক্ষা করতে পারি নি। আমার পিতার বিশেষ আগ্রহ ছিল যে, তিনি তাঁর অন্তত একটি ছেলেকে সংস্কৃত পড়াবেন। তাঁর সেই আগ্রহ তিনি আমারই উপরে প্রয়োগ করেন। টোলের ছাত্র হিসাবেই আমার সংস্কৃত-শিক্ষা শুরু।”

হরিশ্চন্দ্রপুর মধ্যইংরেজি স্কুলে তাঁর সাধারণ পাঠ আরম্ভ। এখানকার পড়া শেষ হবার পর তিনি তাঁর পিতাব ইচ্ছা অনুসারে সংস্কৃত-পাঠ আরম্ভ করেন। সতেরো বছর বয়সে তিনি কাব্যতীর্থ পাশ করেন। সংস্কৃত পাঠের সময় কাদম্বরীকাব্য পাঠ করে তার ইচ্ছে হয় যে, যে মূল গ্রন্থে এর কাহিনীটি আছে, সেই গ্রন্থটি তাঁকে পাঠ করতেই হবে এবং সেই গ্রন্থ থেকে কাহিনী নির্বাচন করে তিনি সংস্কৃতে কাব্য রচনা করবেন।

তাঁর মনের এই ইচ্ছার কথা জানতে পেরে তাঁর অগ্রজ তাঁকে বলেছিলেন যে, কাব্যতীর্থ পাশ করলে তিনি তাঁকে কথাসরিৎসাগর কিনে দেবেন।

কাব্যতীর্থ পাশ করে তিনি কথাসরিৎসাগর উপহার পেলেন। এর পর আরম্ভ হল তাঁর কাব্যরচনার প্রচেষ্টা। কিছুদিনের মধ্যে তিনি সংস্কৃতে তিনটি কাব্য রচনা করলেন।

"প্রথমটির নাম দিই 'চন্দ্রপ্রভা'। এই কাব্য কাদম্বরীর মত গুরুগম্ভীর গদ্যে লেখা। আরম্ভটা ছিল—'আসীৎ শশ্বদসংখ্য লোকসংঘাতসম্মর্দ বিজম্ভৃমাণ'—ইত্যাদি। এতে শ্লেষ-বিরোধাভাস প্রভৃতির অভাব ছিল না। দ্বিতীয়টি 'হরিশ্চন্দ্র-চরিত' কাব্য—মার্কণ্ডেয় পুরাণ থেকে এর কাহিনী নেওয়া; গদ্যে ও পদ্যে মেশানো এই কাব্য। তৃতীয়টি 'পার্বতী-পরিণয়'।"

এর পর তিনি প্রেরিত হন কাশীতে। কাশীতে গিয়ে দর্শন ইত্যাদির চাপে পড়ে কাব্যের ঝোঁক কিছুটা ব্যাহত হয়, কিন্তু তারই মধ্যে রচনা করেন আর-একটি কাব্য, তার নাম দেন 'যৌবন-বিলাস'। এটি ছাপাও হয়। —তখন এঁর বয়স আঠারো। এর পর মেঘদূতের অনুরূপ একটি কাব্য রচনা করেন, তার নাম দেন 'চিত্তদূত'।

ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে পণ্ডিতজন এসে মিলিত হতেন কাশীতে। বয়সে প্রাচীন ও জ্ঞানে প্রবীণ হবার পর বানপ্রস্থ অবলম্বন করেই যেন তাঁরা আসতেন এখানে, এখানে তাঁরা যাপন করতেন কাশীসন্ন্যাস। এই কারণেই কাশী হয়ে উঠেছিল পণ্ডিত ব্যক্তিদের মিলনতীর্থ। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই ছিল তাঁদের ধর্ম।

আকাশে সপ্তর্ষির দ্বারা যেমন ধ্রুবতারকার সন্ধান মেলে, কাশীতে তেমন জ্ঞানের সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন সপ্ত-মহামহোপাধ্যায়ের দ্বারা। তাঁদের নাম সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করলেন শাস্ত্রী মহাশয়—

১ বাল শাস্ত্রী
২ তারারত্ন বাচস্পতি
৩ বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী
৪ কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি
৫ রামমিশ্র শাস্ত্রী
৬ গঙ্গাধর শাস্ত্রী
৭ শিবকুমার শাস্ত্রী

আর এঁদেরই সঙ্গে নাম করলেন শ্রীসুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর। এঁরা প্রকৃতপক্ষে ঋষিই ছিলেন। এঁরা জীবনের ধ্রুবসত্যের সন্ধান দিতে পেরেছেন।

তাঁর অধ্যাপক ছিলেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৈলাসচন্দ্র শিরোমণি ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীসুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী। শিরোমণি-মহাশয়ের কাছে ন্যায় ও শাস্ত্রী-মহাশয়ের কাছে বেদান্ত পাঠ করেন। তখন কাশীতে শিরোমণি-মহাশয় শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ও শাস্ত্রী-মহাশয় শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক। শিরোমণি-মহাশয় সকালে সরকারী সংস্কৃত কলেজে আর অপরাহ্নে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়িতে অবিরাম ছাত্রদের পড়াতেন। তিনি বদ্ধাসনে শিবনেত্রে বসতেন আর এক-একটি ক'রে বহু ছাত্রকে বহু বিষয় পড়াতেন। তিনি বই বা পুঁথি নিয়ে পড়াতেন না। ছাত্ররা পুস্তক পড়ত, তাঁর এসব মুখস্ত ছিল। কাশীতে অনেক হিন্দীভাষী ছাত্র ছিলেন, শেষবয়সে তিনি বাঙালিকে হিন্দিতে ও হিন্দুস্থানীকে বাংলায় পড়িয়ে ফেলতেন। তাঁকে সকলেই মহারাজজী বলে সম্মান করত। বললেন, "আমার প্রিয় বন্ধু মহামহোপাধ্যায় ৺বামাচরণ ন্যায়াচার্য এঁরই ছাত্র ছিলেন।"

অপর দিকে তাঁর বেদান্তের অধ্যাপক শাস্ত্রী-মহাশয় ছিলেন অগ্নিহোত্রী। ইনি গঙ্গার উপরেই দারভাঙ্গার বাড়িতেই থাকতেন। বললেন, "প্রাতে আমরা দেখতাম তিনি অগ্নিহোত্র করে তার ভস্মে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করে

মৃগচর্মের উপরে কুশহস্তে আচমন-পূর্বক বসে আছেন, আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। সন্ধ্যাবন্দনা ক'রে আমাদের যেতে হ'ত, প্রাতে তিনি উপনিষৎ ব্রহ্মসূত্র ও ভাষ্য পড়াতেন। অপরাহ্ণে টীকা প্রভৃতির পাঠ হ'ত। ব্রহ্মসূত্র ও ভাষ্য গুরুমুখেই শ্রবণ করা নিয়ম। এখানে এই একটা কথা মনে হ'ল। সুপ্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর জামাতা হতেন। ইনি ন্যায়ে শিরোমণি-মহাশয়েরও ছাত্র ছিলেন। শ্বশুরের নিকট ইনি বেদান্ত পড়েন। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম চারটি সূত্রের (চতুঃসূত্রীর) ভাষ্য বেশি শক্ত, পরে তত নয়। অথচ নিয়ম রয়েছে, সমস্তটাই গুরুর মুখে শুনতে হবে। লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহাশয়ের এই পাঠ শ্রবণের সময় উপস্থিত। অধ্যাপক শাস্ত্রী-মহাশয়ের অন্যান্য ছাত্রের সঙ্গে আমাকেও বললেন যে, আমরাও যেন একসঙ্গে গুরুমুখে এসব শুনে রাখি।"

তাঁরা অপরাহ্ণে গিয়ে দেখতেন, অধ্যাপক শাস্ত্রী-মহাশয় দেবার্চনা ক'রে অগ্নিহোত্রের ভস্মের ত্রিপুণ্ড্রের উপর চন্দনের তিলকে চর্চিত রয়েছেন। বেদান্তের দুরূহ গ্রন্থসমূহের পাঠ চলেছে। বললেন, "এ সম্বন্ধে আর-একটি ক্ষুদ্র কথার উল্লেখ করব। কিছুদিন পরে তিনি অতর্কিত ভাবে আমাদের বললেন—আমি আর তোমাদের পড়াতে পারব না, আমি এখন মনন করব। উপনিষদে যা অধ্যয়ন করা হয়েছে অনুকূল যুক্তির দ্বারা তা পর্যালোচনার নাম মনন। এর থেকেই বোঝা যাবে ঐ সময়ের গুরু-শিষ্যের মধ্যে প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিটা কতটা আত্মীয়তাপূর্ণ ছিল।"

আক্ষেপ করে বললেন, "কিন্তু আমাদের আজকালকার শিক্ষা? কী করে যে সব গোলমাল হয়ে গেল, তাই ভাবি। এখন সমাজে কেবল মিথ্যা আর প্রবঞ্চনা দেখা দিয়েছে।"

একটু হেসে বললেন, "এখন একটা নিরক্ষর সাঁওতালের যে সত্যনিষ্ঠা আছে, বিধুশেখর ভট্টাচার্যের তা নেই।"

নিজের নাম করে তিনি ধিক্কার দিলেন বর্তমানের তথাকথিত শিক্ষিতদের। বললেন, "কম্‌পাল্‌সারি ফ্রী এডুকেশনের রব উঠেছে চারধারে এখন। কিন্তু এতে কম্‌পালশন্‌ও হচ্ছে ফ্রীও হয়তো হচ্ছে বা হবে—কিন্তু এডুকেশন হবে কি না—তাই ভাববার কথা। আমাদের দেশের সেই ব্রহ্মচর্যপালন ও গুরুগৃহে-বাসই হচ্ছে আসলে নির্ভেজাল কম্‌পাল্‌সারি ফ্রী এডুকেশন। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার এই সূত্রটি ধরতে পেরেছিলেন, তাই স্থাপনা করেছিলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও শান্তিনিকেতন।"

কাশী থেকে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন ১৩১১ সালের মাঘ মাসে। কী উদ্দেশ্যে তিনি কাশী থেকে শান্তিনিকেতনে আসবার জন্য উদ্যত হয়েছিলেন তা তিনি জানতেন না। ভবিষ্যতে সেখানে তাঁর ভালো-মন্দ কী হবে না-হবে, সে কথাও তাঁর মনেই আসে নি। টাকা-পয়সা রোজগারের কোনো প্রয়োজনও তখন মনে হয় নি। কেননা, তাঁর পিতা তখন জীবিত, আর জ্যেষ্ঠাগ্রজ সংসারের যাবতীয় ভার গ্রহণ করেছেন।

বললেন, "জমিদারী না থাকলেও কিছু পত্তনী ছিল আমাদের। বাড়িতে হাতি ছিল, ঘোড়া ছিল। হাতিটা ঠিক মনে পড়ছে না, কিন্তু মস্ত একটা ঘোড়া দেখেছি মনে আছে। বাটি ভরতি খাঁটি দুধ খেয়েছি। মালদহ আমের জন্য বিখ্যাত। আমাদের মস্ত আম-বাগান ছিল, তার থেকেও আয় হত বিস্তর। এইসব কারণে টাকাকড়ি রোজকারের কথা কখনো ভাবি নি।"

অর্থকরী চিন্তায় মন বিভ্রান্ত করতে হয় নি, এই কারণে মন-প্রাণ উৎসর্গ করে তিনি অধ্যয়নে রত হতে পেরেছিলেন। সেই সময় কাশীতে শ্রীমতী অ্যানি বিসান্টের উদ্যমে ও উৎসাহে থিয়সফিক্যাল সোসাইটির খুব প্রভাব ছিল। তিনি জনকয়েক বন্ধুর সঙ্গে এখানে যেতেন। এই সোসাইটি ছিল একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাগানবাড়িতে এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল একটা চমৎকার

লাইব্রেরি। এইসব দেখে তাঁর মনে হত, তিনি যদি এমনি একটি নিভৃত উদ্যান এবং এমনি একটি পাঠাগার পেয়ে যান তাহলে যেন জীবন ধন্য হয়ে যায়।

বললেন, "অন্তর্যামী বিশ্বনাথ আমার অন্তরের এ প্রার্থনা নিশ্চয়ই শুনেছিলেন। তাই আমার আহ্বান এল শান্তিনিকেতন থেকে। আগে বুঝি নি, সেখানে পৌঁছে বুঝতে পারলাম। এখানে এসে দেখলাম আমার মন যা চায় এ স্থানটি তাই।"

কাশীতে তাঁরা জনকয়েক বিদ্যার্থী মিলে একটা সংস্কৃত কাগজ বের করেন। তার নাম দেন মিত্রগোষ্ঠী-পত্রিকা। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন কাশীতে এসে এই উদ্যমে যোগ দেন। তার পর কাশী ছেড়ে চলে আসার পর কাগজটা উঠে যায়।

১৩১১ সনের ১১ই বা ১২ই মাঘ দুপুরে বেনারস-ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে বোলপুর পর্যন্ত একটা টিকিট কেটে বেলা দুটো-আড়াইটার সময় গাড়ি বদল করার জন্যে মোগলসরাই স্টেশনে নেমেই এক বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর দেখা। তাঁর কাছ থেকে শুনলেন, পাঁচ-ছয় দিন হল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পরলোকগমন করেছেন।

বললেন, "শান্তিনিকেতনে এসে প্রথম দেখাতেই স্থানটি আমার চোখে লেগে গেল। আশ্রমটি শাল ও তালের শ্রেণীতে পরিবেষ্টিত বাগানের মধ্যে। আশ্রমের বহু স্থানে উপনিষদের বহু কথা উৎকীর্ণ অথবা লিখিত। অদূরেই পুস্তকালয়—পুস্তকের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও খুব ভালো ভালো বাছাই-বাছাই বই ছিল। দেখলাম, আমার মনের চাহিদার সঙ্গে এর সব-কিছু মিলে যাচ্ছে। তাই, আত্ম-উৎসর্গ করলাম এই স্থানটিতে।"

আরও বললেন, "প্রথমে রবিঠাকুরের কাছে এসেছিলাম। তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্তায় ক্রমশই তাঁর দিকে বেশি আকৃষ্ট হই।

কিছুদিনের মধ্যে কেউ রবিঠাকুর বললে কানে বাধত। যেমন দিন কাটতে লাগল মনের গতিও তেমন-তেমন পরিবর্তন হতে লাগল। তাঁকে গুরুদেব বলে উল্লেখ করতে লাগলাম।”

এখানে কেবল সংস্কৃত অধ্যাপনার জন্যেই তাঁর আগমন। এখানে নিভৃত মনোমত পরিবেশ পেয়ে গেলেন এবং পেয়ে গেলেন একটি পুস্তকাগার। তিনি এই পুস্তকাগারের সংলগ্ন একটি ছোট ঘরে নিজের নীড় রচনা করে নিলেন। নিজেকে যেন পুস্তকালয়ের একটি অংশেই রূপান্তরিত করে নিলেন। কাজ অতি অল্প, হাতে সময় যথেষ্ট, পুস্তকালয়ে ক্রমশ প্রচুর সংস্কৃত গ্রন্থও সংগৃহীত হয়েছে, তিনি তাই আকণ্ঠ ডুবে রইলেন এই গ্রন্থসাগরে।

সংস্কৃতে তাঁর জ্ঞান ছিল, সেই জ্ঞান ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগল; কিন্তু পালি তিনি জানতেন না। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে তিনি পালি পাঠ আরম্ভ করেন এবং ক্রমশ এই ভাষাতেও সবিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং গ্রন্থ-রচনা করেছেন।

“শান্তিনিকেতনে আমরা ছিলাম রাজার হালে। টাকাকড়ি কম ছিল, তাতে আমরা কোনো অভাব বোধ করি নি। উৎকৃষ্ট কামিনী চালের ভাত খেয়েছি, সোনামুগের ডাল খেয়েছি, খাঁটি গব্যঘৃত খেয়েছি— এর বেশি আর কী খেলে রাজা হওয়া যায়?”

রহস্য ক’রে বললেন, “হাতি খেলে, না, ঘোড়া খেলে?”

মনের খোরাকের কথা আগেই বলেছেন, এবার বললেন পেটের খোরাকের কথা। বললেন, “মাইনে বলে যা পেতাম তা হয়তো সামান্যই, কিন্তু অভাব ছিল না কোনো। এখন আমরা আমাদের অভাব সৃষ্টি করতে শিখেছি, তাই দুঃখও আমাদের বারমেসে সঙ্গী হয়েছে।”

যে শিক্ষাধারায় তাঁরা মানুষ, অধ্যাপনার যে আদর্শে তাঁরা অনুপ্রাণিত বর্তমানে তার কিছুই নেই দেখে দুঃখ প্রকাশ করলেন। বললেন,

"আমাদের মধ্যের সরলতা উধাও হয়ে গেছে। বাল্যকালে আমরা দেখেছি উচ্চবংশের কোনো বাড়ির বিয়ের উৎসবে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের সহযোগিতা। যারা ঢোল বাজায় তারা জাতিতে হাড়ি, যাদের আমরা আজকাল অবজ্ঞা করে দূরে ঠেলে রাখি, কিন্তু সেকালে বিয়েবাড়িতে তারা ঢোল বাজাত আর গৃহস্থবাড়ির মেয়েরা সেই ঢোলের তালে তালে উৎসবের নাচ নাচত, ধোবানি এসে খাড় দিয়ে বিয়ের ক'নের হাত সাফ করে দিয়ে যেত, নাপিত-বউ এসে আলতা দিয়ে পা রাঙিয়ে দিয়ে যেত। তখন সকলে মিলে ছিল একটা গোষ্ঠী। আজকালকার শহুরে শিক্ষায় আমরা ছন্নছাড়া হয়ে যাচ্ছি। এসব প্রতিরোধ করা যায় কী করে তা ভেবে দেখতে হবে—তা না হলে আমাদের সমূহ বিপদ।"

আগুন দিয়ে ভালো কাজও করা যায়, আবার খারাপ কাজও করা যায়। আগুনের চুল্লি জ্বালিয়ে রন্ধন ক'রে মহোৎসবও যেমন করা যায়, তেমনি অন্যের ঘরে আগুনও লাগানো যায়। আমাদের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থাকে তিনি তুলনা করলেন এই আগুনের সঙ্গে। বললেন, "আগে এ দিয়ে হত মনের প্রাঙ্গণে মহোৎসব, এখন আমাদের মনের ঘরে আগুন লেগেছে।"

সেকালের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে বললেম, "সব কালেই অবশ্য সু ও কু সমাজে পাশাপাশি বাস করে। সেকালেও কাশীতে এক জঘন্য ব্যাপার আমরা দেখেছি। সে কথাটা হয়তো সকলে জানে না ; আমি আজ সে কথা জানিয়ে যাওয়া কর্তব্য বলে মনে করি।"

তিনি বলে গেলেন কাহিনীটি। কৃষ্ণানন্দস্বামীর বিরুদ্ধে কাশীর তৎকালীন কতিপয় ব্রাহ্মণের চক্রান্তের কথা। কৃষ্ণানন্দস্বামীর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বের নাম কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। তাঁর নিবাস ছিল গুপ্তিপাড়ায়। তারপর মুঙ্গেরে তিনি

প্রথমজীবনে কেরানিগিরি করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি কৃষ্ণানন্দস্বামী বলে খ্যাত হন। অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন তিনি। হিন্দুত্বের গতি করবার জন্যে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে হিন্দী ও বাংলায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। এর ফলে হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে তাঁর অশেষ প্রতিপত্তি হয়। কাশীর কতিপয় ব্রাহ্মণ এতে বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠেন। "একজন বৈদ্য হয়ে তিনি হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী হবেন, কোনো ব্রাহ্মণেরা তা বরদাস্ত করতে রাজি নন। তাঁরা কদর্য চক্রান্তের দ্বারা তাঁকে জেলে প্রেরণ করেন। সে হীন কুৎসার কথা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। কিন্তু—" শাস্ত্রী মহাশয় জোর দিয়ে বললেন, "এ অপবাদ মিথ্যা। তার প্রমাণ আমি জানি।"

প্রসিদ্ধ নৈয়াকিক রাখালদাস ন্যায়রত্ন তখন কাশীবাসের জন্য সেখানে যান। এলাহাবাদ জেল থেকে কৃষ্ণানন্দস্বামী মুক্তি লাভ করে ফিরে এসেছেন কাশীতে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র হরকুমার ভট্টাচার্য 'শঙ্করাচার্য' নামে এক নাটক লেখেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় রত্ন চিনতেন। তিনি পুত্রকে পরামর্শ দিলেন যে, নাটকটি নিয়ে যেন কৃষ্ণানন্দস্বামীকে শুনিয়ে তাঁর মতামত নেওয়া হয়। শাস্ত্রী মহাশয় হরকুমার ভট্টাচার্যের সঙ্গে কৃষ্ণানন্দস্বামীর কাছে যান। নাটকটি শুনে কৃষ্ণানন্দের চোখে জলের ধারা নামে।

বললেন, "মানুষের মধ্যে পদার্থ না থাকলে সে কখনো এমন অভিভূত কি হয়?"

তাছাড়াও নাকি আছে এক প্রমাণ। তখন তাঁরা কাশীর এক পণ্ডিতের বাড়িতে যেতেন। সেখানে গিয়ে একদিন বৈঠকখানার মেজেতে পুরাতন একটি চিঠি পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি চিঠিটি পড়লেন।

বললেন, "তাতে কৃষ্ণানন্দের কথা লেখা। লেখক হচ্ছেন বঙ্গবাসীর সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বসু। তিনি লিখেছেন—'কেড়ো বাঘ ফাঁদে পড়েছে, কিছুতে ছাড়া নয়।'—কৃষ্ণানন্দের বিরুদ্ধে চক্রান্তের এটা একটা দলিল।"

ত্রিশটি বৎসর তিনি কাটিয়েছেন শান্তিনিকেতনে। ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি এখানে আসেন, তার পর একে একে জীবনের সমস্ত শক্তি ও সাধনা তিনি এখানে উজাড় করে দেন। তাঁদের সমবেত চেষ্টায় যেমন গড়ে ওঠে শান্তিনিকেতন, তেমনি তাঁরা নিজেও ক্রমশ গঠিত হয়ে ওঠেন এখানে। 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'—এই বেদবাক্যটি সার্থক হয়ে উঠেছে যেখানে, সেই শান্তিনিকেতনের কথায় তিনি পঞ্চমুখ। বললেন, "টাকা দিয়ে সহজেই বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপন করা যায়, বিশ্বভারতী স্থাপন করা যায় না। আমার তো মনে হয়, যা প্রকৃত বিপদ তা-ই সম্পদের আকারে এখন দেখা দিয়েছে ওখানে।"

বাইরের রাস্তা থেকে ভারি ট্রাকের আওয়াজ আসছিল মাঝে মাঝে, মাঝে মাঝে মালগাড়ির ছুটন্ত হুইসলের শব্দও পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু সেসব শব্দ এসে এখানে কোনো বিঘ্নের সৃষ্টি করতে পারে নি।

পূজোর উৎসব শেষ হয়েছে, দু দিন আগেই গিয়েছে বিজয়াদশমী ; শাস্ত্রী মহাশয়কে প্রণাম ও কোলাকুলি করতে এসেছেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তিনি কয়েকটি কীর্তনের আসরের গল্প করলেন। উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল শাস্ত্রী মহাশয়ের বৃদ্ধ চোখ দুটি। দুটি করতালের মত কেঁপে উঠল তাঁর দুটি হাত। তাঁর এই উৎসাহ দেখে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বললেন, "আপনি বৈষ্ণব কি বৌদ্ধ কি শাক্ত কি ব্রাহ্ম—কিছু বুঝবার উপায় নেই।"

শিশুর সারল্যে আবার হাসলেন শাস্ত্রী মহাশয়। সে হাসিতে যেন স্বীকৃতি আছে যে, তিনি নিজেও জানেন না, তিনি কি।

গড়িয়াহাট রোডে বিকেল নেমেছে। আপিস-আদালত বন্ধ। তবু ভিড় বন্ধ হয় নি। যান-বাহনে রাস্তা ঠাসাঠাসি। দুটো বাস মুখোমুখী হয়ে মাঝরাস্তায় আটক পড়ে গেছে। যেন কোলাকুলি করছে তারা। পুলিশের বাঁশি বাজছে, বাস্-এর হর্ন বাজছে। তবুও রাস্তা পরিষ্কার হচ্ছে না।

গীতা-গ্রন্থের বিজ্ঞাপনটা পড়লাম ভালো করে। লাল হরফে লেখা, বড় বড় অক্ষর। বিজ্ঞাপনের বহর দেখে মনে হল, এ যেন গীতার নয়, বহরের ননীর বিজ্ঞাপন, অথবা কোনো লিপস্টিকের।

শাস্ত্রী মহাশয়ের কথাটা মনে পড়ল, "সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল চারদিকে। চারদিকে কেবল গলাবাজি আর প্রপাগাণ্ডা। এতে জীবন থেকে আমাদের সার উপে যাচ্ছে, আমরা ভেজালের ভক্ত হয়ে পড়ছি। আসল আর মেকি ধরা এখন দায়। ছিলাম আমরা পুরুষ, এখন যা হচ্ছি তা কাপুরুষ।"

সংস্কৃত শ্লোকটা আওড়াতে আওড়াতে ফিরে এলাম, 'ফলং বৈ কদলীং হন্তি—।'

রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

ন্যায়প্রবেশ ॥ আচার্য দিঙ্‌নাগ-কৃত। দ্বিতীয় খণ্ড। মূল তিব্বতী। সংস্কৃত ও চীনা পাঠের সঙ্গে উপমিত। ভূমিকা, তুলনামূলক টীকা, সূচীপত্র সম্বলিত। গায়কোয়াড় প্রাচ্য গ্রন্থাবলী

২ ভোটপ্রকাশ ॥ অর্থাৎ তিব্বতী পাঠাবলী (Tibetian Chrestomathy), ভূমিকা, সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ, টীকা, মূল পাঠ ও শব্দাবলী —সংস্কৃত থেকে তিব্বতী, তিব্বতী থেকে সংস্কৃত

আগমশাস্ত্র ॥ গৌড়পাদ-কৃত। মূল সংস্কৃত। রোমান হরফে এবং ইংরেজি ভাষায় ব্যাখ্যাত। বিস্তৃত ভূমিকা সহ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

আগমশাস্ত্র ॥ গৌড়পাদ-কৃত। নাগরী অক্ষরে মূল সংস্কৃত কারিকা ও সংস্কৃতে লিখিত ব্যাখ্যা। সূচীপত্র সহ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

The Basic Conception of Buddhism: being the Adhar Chandra Mookherjee Lectures, 1932. Calcutta University.

শতপথব্রাহ্মণ ॥ মাধ্যন্দিন শাখা। প্রথম দুই খণ্ড। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ

মিলিন্দপ্রশ্ন ॥ মূল পালি ও বঙ্গানুবাদ। দুই খণ্ড। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

পালিপ্রকাশ ॥ অর্থাৎ পালিভাষার ব্যাকরণ পাঠাবলী শব্দকোষ ও বিস্তৃত ভূমিকা

প্রাতিমোক্ষ ॥ অর্থাৎ বিনয়পিটকে ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ। মূল পালি বঙ্গানুবাদ ও বৃহৎ ভূমিকা

মহাযানবিংশক ॥ নাগার্জুন-কৃত। তিব্বতী ও চীনা থেকে পুনরুদ্ধৃত সংস্কৃত পাঠ ও ইংরেজি অনুবাদ। বিশ্বভারতী

বিবাহমঙ্গল ॥ হিন্দু-বিবাহের উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে বিবিধ মূল মন্ত্র ও বাক্যের মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ

চতুঃশতক ॥ আর্যদেব-কৃত। তিব্বতী থেকে পুনরুদ্ধৃত মূল সংস্কৃত ও তিব্বতী পাঠ। চন্দ্রকীর্তি-কৃত টীকার সার-সহিত। বিশ্বভারতী

মধ্যান্তবিভাগসূত্রভাষ্যটীকা ॥ স্থিরমতি-কৃত। তিব্বতী পাঠের সঙ্গে উপমিত মূল সংস্কৃত। বহু টিপ্পনী-সহিত। ইটালির রয়াল অ্যাকাডেমির অধ্যাপক জি. তুচ্চির সঙ্গে একত্র সম্পাদিত

যোগাচারভূমি ॥ প্রথম খণ্ড। অসঙ্গ-কৃত। তিব্বতীর সঙ্গে উপমিত মূল সংস্কৃত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

The Historical Introduction to the Indian Schools of Buddhism, in the volume: History of Philosophy—Eastern and Western. Sponsored by the Ministry of Education, Government of India

শ্রীরাজশেখর বসু

সকাল বেলার নিস্তব্ধ বকুলবাগান। ভাদ্র মাসের রোদ্দুর সারা বকুলবাগানে ছড়ানো। পীচঢালা রাস্তা সটান চলেছে পশ্চিম থেকে পূবে।

ছুটির সকাল। লোক-চলাচল তাই শুরু হয়নি এখনো। সকাল সাতটা থেকে সাড়ে নয়টার মধ্যে পৌছবার কথা। সাতটা বেজে গেছে, তাই দ্রুতপদে চলছিলাম। সূর্যটা ঠিক চোখের সামনে। আলোটা এত তেজী যে, রাস্তাই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না।

বাহাত্তর নম্বর পেরিয়ে এক শ বেয়াল্লিশে পৌছে হুঁশ হল। পিছিয়ে এলাম।

বকুলবাগানকে নিস্তব্ধ দেখে এলাম, কিন্তু বাহাত্তর নম্বর বাড়িটা নিস্পন্দ, নিরালা। লোহার গেট দিয়ে শক্ত ক'রে বাড়িটার নিভৃতি যেন বাঁধা আছে। এখানে থাকেন শ্রীরাজশেখর বসু—বাংলা সাহিত্যের পরশুরাম। কলকাতা শহরের জনারণ্য ও যানারণ্যের এক পাশে একে বলা যায় একটা নিভৃত নিকেতন। জীবনের কর্মময় দিন পেরিয়ে এসে ধ্যানময় দিন যাপনের জন্যে স্তব্ধতার ইঁট দিয়ে গড়া হয়েছে যেন এই গৃহ।

বরান্দায় উঠে চারদিকে তাকিয়ে ভাবতে ভালো লাগল যে, এইখানে বসেই রচিত হয়েছে ব্যাসের মহাভারত এবং বাল্মীকির রামায়ণ।

খবর দিতেই তিনি নেমে এলেন। না হেসে বললেন, "আপনি বুড়োদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন বুঝি ?"

বলতে পারলাম না—বুড়ো খুঁজছি নে, খুঁজছি বড ; যাঁরা কেবল বয়সে বড হন নি, চিন্তায় আর চেষ্টায়, সাধনায় আর নিষ্ঠায় বড় হয়েছেন।

তাঁর সাহিত্যিক জীবনের কথা উঠলে তিনি বললেন, "জীবনে প্রথম লিখি বেয়াল্লিশ বছর বয়সে, ১৯২২ সালে। সে লেখাটা হচ্ছে শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড। লেখাটি প'ড়ে অনেকের ধারণা হয়েছিল যে, এটি কোনো উকিলের লেখা।"

অথচ এ লেখাটা কোনো আইনজীবীর নয়, একজন বিজ্ঞানীর লেখা, একজন রসায়নশাস্ত্রীর।

আইন তিনি পড়েছিলেন, আইন পাশও করেছিলেন, কিন্তু ওকালতি করেন নি।

"আমার পিতা ছিলেন দ্বারভাঙ্গা স্টেটের ম্যানেজার। দ্বারভাঙ্গা রাজস্কুল থেকে এনট্রান্স পাশ করি, আর পাটনা থেকে ফার্স্ট আর্টস। তারপর বি. এ. আর কেমিস্ট্রি নিয়ে এম. এ. পাশ করি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।"

প্রসঙ্গত বললেন যে, রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের দাদা মহেন্দ্রপ্রসাদ পাটনায় তাঁর সহপাঠী ছিলেন।

শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড লেখার জন্যেই কি তাহলে তিনি জীবনে প্রথম সাহিত্যিক কলম ধরেছিলেন, এর আগে কখনো কোনো দিন দু-এক ছত্র লেখার শখও কি হয়নি?

বললেন, "হয়েছিল। শিশুদের যেমন একবার হাম-ডিপথেরিয়া হওয়াটা একটা নিয়ম। তেমনি প্রাকৃতিক নিয়মে কবিতা লেখার শখ হয়েছিল বাল্যকালে, তখন দু-এক ছত্র লিখেছি। কিন্তু তা পনর-ষোলো বছর বয়সের মধ্যেই চুকে যায়।"

পাটনায় সাহিত্যালোচনা তাঁদের হত। সহাধ্যায়ী ও সতীর্থদের সঙ্গে। পাটনায় তাঁর সঙ্গে নয়-দশ জন বাঙালি ছাত্র ছিলেন। তখন বঙ্কিম-হেম-নবীনের প্রবল প্রতাপ। তাঁরাই বাঙালির মন আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন।

রাজশেখর বসু
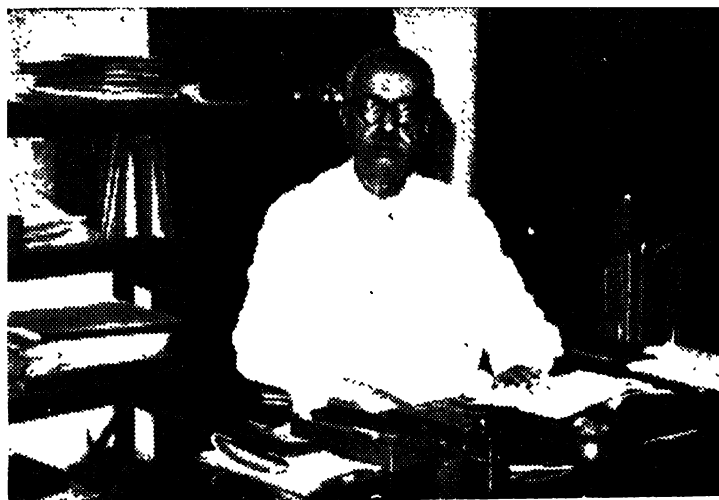
কিন্তু তার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ নিয়েও আলোচনা হত। সতীর্থদের মধ্যে অনেকে বলতেন, বঙ্কিমের মত প্রতিভা নেই, ইউরোপেও নেই; আবার কেউ কেউ বলতেন, রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমকেও হারিয়ে দেবেন।

বললেন, "রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। তখন তিনি কেবল কবি বলেই পরিচিত ছিলেন, গল্প-উপন্যাস বেশি লেখেন নি। সে আমলে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সাধারণ নালিশ ছিল এই যে, তাঁর লেখা কিছু বোঝা যায় না।"

সাহিত্যের সঙ্গে রাজশেখরের সম্পর্ক ছিল কম। জীবনে যেটুকু সাহিত্যচর্চা হয়েছে তা কেবল সহাধ্যায়ীদের সঙ্গে আলোচনা এবং অবসর সময়ে সাহিত্যগ্রন্থাদি পাঠ করা। যেমন আর পাঁচ জনে করে। উত্তর-জীবনে কোনো দিন স্বয়ং সাহিত্যিক হয়ে উঠবেন এবং সাহিত্য-রসে নিজেকে জারিত করে নেবেন—এমন সম্ভাবনাও ছিল না, এমন কল্পনাও মনে উদিত হয় নি কখনো। কেননা, তাঁর ছাত্রজীবন শেষ হবার সঙ্গেসঙ্গে তিনি যে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন, সে জীবন আর যাই হোক, তার সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক ছিল না আদপে। অনেকে সে জীবনকে রসময় জীবন বললেও বলতে পারেন, কেননা সে জীবন ছিল পুরোপুরি রসায়নেই জারিত।

প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি রসায়নে এম. এ. পাশ করেন। বিজ্ঞানে যখন এই পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন, তখন উত্তরজীবনে বিজ্ঞানই হবে তাঁর একমাত্র সাধনার ক্ষেত্র—এ বিশ্বাস তাঁর সম্ভবত ছিল। সেইজন্যেই তিনি সেই দিকেই নিজের মনকে চালিত করেছিলেন।

বললেন, "আমি কলেজ ছেড়েই এক রাসায়নিক কারখানায় যোগ দিই। এইখানে একাদিক্রমে ত্রিশ বছর অধ্যক্ষের কাজ ক'রে স্বাস্থ্যহানির দরুন ১৯৩২ সালের শেষের দিকে অবসর গ্রহণ করি।"

এই কারখানার নাম বেঙ্গল কেমিক্যাল। এখানে তিনি যোগ দেন রাসায়নিক হিসেবে, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালন-ভার তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁরই ছাত্রের উপর।

বাংলা ভাষার উপর তাঁর আন্তরিক টান যে ছিল তার নমুনা পাওয়া গেছে এখানেই। এখানে হিসাবপত্রাদি রাখার নিয়ম করেন বাংলায়, বিভিন্ন বিভাগের নাম করেন বাংলায়, ওষুধপত্রের নামও হয় সংস্কৃত-ইংরেজী মিশিযে। গম্ভীর হয়ে বললেন, "সাহিত্যচর্চার কথা বলছিলেন না? বাল্যের কবিতা রচনার শখের কথা বাদ দিলে এই প্রতিষ্ঠানেই আমার সাহিত্যচর্চার আরম্ভ। এখানেই তার হাতে-খড়ি বলতে পারা যায়। অবশ্য মূল্যতালিকা তৈরি করা বা বিজ্ঞাপন লেখাকে যদি কেউ সাহিত্য বলে গ্রাহ্য করে। কেননা শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডের আগে আমার যা-কিছু বাংলা রচনা তা এ ছাড়া আর কিছু না।"

শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড লিখেই তাঁর লেখা হয়তো শেষ হয়ে যেত। এই গল্পটি তিনি রচনা করেন জনকয়েক ধুরন্ধর ব্যবসায়ীকে ব্যঙ্গ করার জন্যে, তাঁর সে উদ্দেশ্যসাধন এর দ্বারাই হয়ে যায়। আর কিছু লেখার ইচ্ছেও ছিল না, প্রেরণাও ছিল না। কিন্তু তাঁর প্রেরণা হয়ে এলেন জলধর সেন; সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড ভারতবর্ষে ছাপা হবার পর জলধরবাবু তাঁকে আরও লেখার জন্যে চাপ দিতে লাগলেন। এঁরই তাগাদায় এবং এঁরই প্রেরণায় তাঁকে একে একে লিখতে হল চিকিৎসা-সংকট, মহাবিদ্যা, লম্বকর্ণ, ভুশণ্ডীর মাঠে।

এই ভাবে জমে উঠল কয়েকটি গল্প। তখন প্রেরণা দিতে এলেন আর-একজন, তিনি শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গল্পগুলি হয়তো সাময়িকপত্রের পাতার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকত, কিন্তু উৎসাহী ব্রজেনবাবুর

উদ্যোগে এই কয়টি গল্প একত্র করে প্রকাশিত হল প্রথম বই গড্ডলিকা ১৩৩২ সালে।

বকুলবাগানের বাড়ি তখন হয় নি, তাঁরা তখন থাকেন পার্শিবাগানের পৈতৃক ভবনে। এখানে তাঁদের একটা আড্ডা ছিল, নাম আরব্রিট্রারী ক্লাব, পরে বাংলা নাম হয় উৎকেন্দ্র। এই সংঘের সদস্যদের মধ্যে জলধরবাবু, প্রবাসীর কেদারবাবু, ব্রজেনবাবু প্রভৃতি ছিলেন। শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন ছিলেন সভাপতি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে মাঝে মাঝে আসতেন।

আজ মনে হচ্ছে, বাংলা সাহিত্যে রাজশেখর বসুকে দান করেছেন যাঁরা, তাঁরা আর কেউ না, তাঁরা ঐ ব্যবসায়ী ধুরন্ধরেরাই। তাঁদের ঠাট্টা করতে গিয়ে বাংলা দেশের একজন অখ্যাত রাসায়নিক বাংলা সাহিত্যের একজন প্রখ্যাত রসসাহিত্যিক হয়ে উঠলেন। একজন রসায়নশাস্ত্রী হয়ে উঠলেন, একজন রসশাস্ত্রী। এত ছোট একটা উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে এমন একটা মহোৎসব বড়-একটা দেখা যায় না।

জলধরবাবু আর ব্রজেনবাবু যে চারাগাছটির সন্ধান পেয়েছিলেন, স্নেহের জলে ও উৎসাহের রৌদ্রে সেই শিশুবৃক্ষটিকে বিরাট মহীরুহে পরিণত করার জন্যে তাঁরা চেষ্টা করেছেন, এজন্য বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্য তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু সেই চারাগাছটির সূচনায় ছিল যে অঙ্কুর, যে জনকয়েক ব্যবসায়ী তাঁদের আচার এবং আচরণের দ্বারা তার বীজটি উপ্ত করে গেছেন তাঁদের সেই আচার-আচরণকে সমর্থন না করলেও তাঁদের আজ ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছা করে। কেননা তাঁরাই পরশুরামকে প্রস্তুত করেছেন।

পয়লা সেপ্টেম্বর ১৯৫২, ১৬ই ভাদ্র ১৩৫৯। সকালবেলা তাঁর সম্মুখে বসে তাঁর জীবনের কাহিনী শুনছি। ছোট ছোট কাটা-কাটা কথা দিয়ে গম্ভীর মুখে তিনি ধীরে ধীরে বলে চলেছেন।

দুর্গাপূজার আর বেশি দেরী নেই। সর্বজনীন পূজোর জন্যে পাড়ায়-পাড়ায় যুবকমহলে উৎসাহের ধুম পড়ে গেছে। আমরা কথা বলছি. এমন সময় বকুলবাগানের পূজো-কমিটির জনৈক তরুণ উৎসাহী এসে বাণী চাইলেন রাজশেখরবাবুর কাছে।

—"বাণী ?" তিনি যুবকটির মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "বাণী কি ? বাণীর মত ভণ্ডামি আর কিছুই নেই।"

নিরুৎসাহও করলেন না, বাণীও দিলেন না, কেবল বললেন, "পূজোপার্বণের মত উৎসবের দিনে রেডিয়োর প্রেমসংগীত বন্ধ করা যায় কি না, সেইটে দেখ। আর, ওরিয়েণ্টাল দুর্গা, ওরিয়েণ্টাল সরস্বতী নাম দিয়ে প্রতিমা গড়ার সময় আর্টের যে শ্রাদ্ধ হচ্ছে তা রোধ করা যায় কি না তার উপায় খোঁজো।"

বাণী দিলেন না বটে, বাণী দেওয়ার মত অপ্রীতিকর বিষয় নেই ব'লে মন্তব্য করলেন বটে, কিন্তু পূজো-কমিটির প্রতিনিধি তাঁর এই উক্তি কয়টিকেই তাঁর বাণী বলে গ্রহণ করে চলে গেলেন। এর দ্বারা কোনো কাজ হবে কি না জানি নে, যদি এই কথা কয়টির জন্যে অন্তত একটা দুর্গা-প্রতিমাও এ বছর তথাকথিত ওরিয়েণ্টাল আর্টের কবল থেকে রক্ষে পায়, তাহলেই অনেকটা কাজ হয়েছে বলে স্বীকার করতে হবে।

আমাদের কথায় ছেদ পড়ে গিয়েছিল। বাংলার রুচি ধীরে ধীরে কি ভাবে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে, হয়তো তার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়েছেন মনে মনে। হয়তো তাঁর মনে পড়ে গেছে পুরাতন বাংলার কথা, তার অকৃত্রিম সাধনার কথা, অবিকৃত রুচির কথা, তার জ্ঞানের কথা। মনে পড়ে গেছে বাংলার যশস্বী ও মনস্বীদের কথা।—

বললেন, "যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় সম্বন্ধে আপনার লেখাটি দেখেছি। খুব ভালো করেছেন লিখে।"

হয়তো সে তার এই নামের জন্যে বিন্দু-বিসর্গও কেয়ার করত না। নিজের নামটি ধার দিয়ে একজনকে সে কৃতার্থ করে দিয়েছে বলে তার আত্মতৃপ্তিও হয়তো হত না।

বললেন, "জীবনে আমি খুবই কম লোকের সঙ্গে মিশেছি, তাই আমার অভিজ্ঞতাও খুব কম। গ্রাম বেশি দেখি নি। কর্মক্ষেত্রে যাদের সঙ্গে মিশেছি তারা সব ব্যবসায়ী আর দোকানদার ক্লাস।"

অভিজ্ঞতা কম হতে পারে, কিন্তু সেই সামান্য অভিজ্ঞতাকেই তিনি যে অসামান্য কাজে লাগিয়েছেন তার প্রমাণ তো তাঁর প্রথম গল্পই। এও তো একটা ব্যবসায়ী ক্লাসকে ব্যঙ্গের অভিপ্রায়ে নিজের অজানিতেই একটা সৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে। গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়াকে আজ কে না চেনে?

গড্ডলিকা প্রকাশিত হবার পর প্রমথ চৌধুরী এঁর সম্বন্ধে সবুজ পত্রে প্রবন্ধ লেখেন এবং রবীন্দ্রনাথ লেখেন প্রবাসীতে।

এইসব ঘটনার পর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রবীন্দ্রনাথকে কৃত্রিম অভিযোগ জানিয়ে লেখেন যে, তিনি পরশুরামের এত সুখ্যাতি করায় প্রফুল্লচন্দ্রকে অসুবিধায় পড়তে হবে এই আশঙ্কা তাঁর হয়েছে; কেননা প্রশংসার দরুন বেঙ্গল কেমিক্যাল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। হয়তো এতে গড্ডলিকা হাজার বারো বিক্রী হবে, এবং কোম্পানির ম্যানেজার কেমিস্ট্রি ছেড়ে গল্প নিয়ে মত্ত হয়ে যাবেন।

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

"শান্তিনিকেতন

সুহৃদ্বর, বসে বসে Scientific American পড়ছিলুম, এমন সময় চিঠির খামের কোণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-সরস্বতীর পদাঙ্ক দেখতে পেয়ে সন্দেহ হল আমার হৃৎপদ্ম থেকে কাব্যসরস্বতীকে বিদায় করে তিনি স্বয়ং আসন নেবেন এমন একটা চক্রান্ত চল্‌চে। খুলে দেখি, যাকে

বলে ইংরেজিতে টেবিল-ফেরানো—আমারই পরে অভিযোগ যে, আমি রসায়নের কোঠা থেকে ভুলিয়ে ভদ্রসন্তানকে রসের রাস্তায় দাঁড় করাবার দুষ্কর্ম্মে নিযুক্ত। কিন্তু আমার এই অজ্ঞানকৃত পাপের বিরুদ্ধে নালিশ আপনার মুখে শোভা পায় না; একদিন চিত্রগুপ্তের দরবারে তার বিচার হবে। হিসাব করে দেখবেন কত ছেলে যারা আজ পেটমোটা মাসিকপত্রে ছোটগল্প আর মিলহারা ভাঙা ছন্দের কবিতায় সাহিত্যলোকে একেবারে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারত, এমন কি, লেখাদায়গ্রস্ত সম্পাদকমণ্ডলীর আশীর্ব্বাদে যারা দীপ্তশিখা সমালোচনায় লঙ্কাকাণ্ড পর্য্যন্ত বড় বড় লাফে ঘটিয়ে তুলত, তাদের আপনি কাউকে বি. এস-সি, কাউকে ডি. এস-সি লোকে পার করে দিয়ে ল্যাবরেটরির নির্জ্জন নিঃশব্দ সাধনায় সন্ন্যাসী করে তুললেন। সাহিত্যের তরফ থেকে আমি যদি তার প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে থাকি কতটুকুই বা কৃতকার্য্য হয়েছি। আপনার রাসায়নিক বন্ধুটিকে বলবেন মাসিকপত্র বলে যেসব জীবাত্মা হয়ত বা সাহিত্যবীর হতে পারত ভুশণ্ডীর মাঠে তাদের অঘটিত সম্ভাবনার প্রেতগুলির সঙ্গে আপনার মোকাবিলার পালা যেন তিনি রচনা করেন।

"আমার কথা যদি বলেন আপনার চিঠি পড়ে আমি অনুতপ্ত হইনি, বরঞ্চ মনের মধ্যে একটু গুমর হয়েচে। এমন কি ভাবচি স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মত শুদ্ধির কাজে লাগব, যেসব জন্মসাহিত্যিক গোলেমালে ল্যাবরেটরির মধ্যে ঢুকে পড়ে জাত খুইয়ে বৈজ্ঞানিকের হাটে হারিয়ে গিয়েছেন তাঁদের ফের একবার জাতে তুলব। আমার এক-একবার সন্দেহ হয় আপনিও বা সেই দলের একজন হবেন, কিন্তু আর বোধ হয় উদ্ধার নেই। যাই হোক, আমি রস-যাচাইয়ের নিকষে আঁচড় দিয়ে দেখলেম আপনার বেঙ্গল কেমিক্যালের এই মানুষটি একেবারেই কেমিক্যাল গোল্‌ড্ নন্, ইনি খাঁটি খনিজ সোনা।

"এ অঞ্চলে যদি আসতে সাহস করেন তাহলে মোকাবিলায় আপনার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করা যাবে। ইতি ১৮ অগ্রান ১৩৩২

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে লিখিত এই চিঠিটা সযত্নে রেখে দিয়েছেন, আমাকে দেখতে দিলেন।

আর-একটা চিঠিত দেখলাম, রাজাগোপালাচারীর লেখা—তাঁর লেখার তামিল অনুবাদ দেখে রাজাজী অযাচিত ভাবে তাঁকে একটা প্রশংসাপত্র পাঠান।

কয়েকটি ভাষায় এঁর রচনা অনূদিত হয়েছে। যেমন, হিন্দী তামিল তেলুগু আর কানাড়ী।

কর্মস্থান থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন, আগেই বলেছি, ১৯৩২ সালে। অবসর গ্রহণের পরে সাত-আট বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা ও বানান-সংস্কার-সমিতির সভাপতিত্ব করেন, এখন তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সরকারী কার্যের পরিভাষা-সমিতির সভাপতি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৫ সালে সরোজিনী পদক ও ১৯৪০ সালে জগত্তারিণী পদক দিয়ে এঁকে সম্মানিত করেছেন।

বকুলবাগানের রাস্তার একপাশে ছায়া দেখা গিয়েছে এখন। সেই ছায়ায় ছায়ায় ধীরে ধীরে হাঁটা দিলাম। সূর্যকে সম্মুখে করে যাত্রা

করেছিলাম, এখন সে সূর্য আমার পিছনে। মনে হল, সত্যিই এক সূর্য-প্রতিভাকেই যেন ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

রচিত গ্রন্থাবলী

গড্ডলিকা । গল্পসংগ্রহ
কজ্জলী । গল্পসংগ্রহ
চলন্তিকা । অভিধান
হনুমানের স্বপ্ন । গল্পসংগ্রহ
লঘুগুরু । প্রবন্ধসংগ্রহ
মেঘদূত । সটীক বাংলা অনুবাদ
বাল্মীকি রামায়ণ । সারানুবাদ
মহাভারত । সারানুবাদ
ভারতের খনিজ
কুটীরশিল্প
হিতোপদেশের গল্প
গল্পকল্প
ধুস্তুরী মায়া । গল্পসংগ্রহ

সংস্কৃতে তিনি সুপণ্ডিত। কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে তাঁর শিক্ষা। কিন্তু তিনি অন্যান্য ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধেও পারদর্শী। গুজরাটি ও হিন্দীতে তাঁর মৌলিক গ্রন্থ আছে। রামনারায়ণ পাঠক সম্পাদিত গুজরাটি পত্রিকা 'প্রস্থানে'র তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। ১৯১০-১৫ সালে তিনি এই কাগজে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। অভিনব ভারত গ্রন্থমালার প্রথম বই হিন্দী 'ভারতে জাতিভেদ' তাঁর রচিত; এই বই বাংলা 'জাতিভেদ' গ্রন্থের অনেক আগে লেখা; বাবু পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনের পুস্তক-প্রকাশন-প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত 'সংস্কৃতি সংগম' তাঁর রচিত। গান্ধীজীর তিরোভাবের পর অহিন্দীভাষীর হিন্দীচর্চার জন্য ভারতব্যাপী যে পুরস্কার দেবার নীতি প্রবর্তিত হয়েছে, ১৯৫০ সালে তিনি তার প্রথম পুরস্কার 'তাম্রপট্ট' লাভ করেন।

যিনি ভক্তকবি কবীরের ভাবসমুদ্র মন্থন করে রত্ন উদ্ধার করেছেন, যাঁর মুখে সব সময় কবীরের বাণী লেগে আছে. যিনি কবীরের কথায় পঞ্চমুখ তাঁর সঙ্গে বসে কথা বলছি কলকাতার কবীর রোডে। এই যোগাযোগটির কথা ভেবে ভালো লাগল। শান্তিনিকেতনে কবির সাধনতীর্থে গিয়ে এঁর সঙ্গে দেখা করতে পারিনি বলে আক্ষেপ সম্পূর্ণ দূর হল না বটে, কিন্তু এও তো মন্দ না। যিনি কবীরের ভক্ত, সেই ভক্ত এখন কবীরের নাম-চিহ্নিত রাস্তার এই গৃহ-অলিন্দে বসে কবীর-বাণী উদ্ধৃত করে বললেন—

করনা নঁহী মন দিলগিরী।
জব জাগো তব মুসাফিরী।

'মন অবসন্ন হয়ো না, যতক্ষণ জেগে থাক ততক্ষণ নিজেকে যাত্রী মনে করবে।'

তিয়াত্তর বছর বয়স হয়েছে, জীবনের যাত্রা শুরু হয়েছে অনেক দিন আগে, কিন্তু এখনো তিনি শ্রান্ত নন ক্লান্ত নন, এখনো তিনি পরিশ্রম

করেন সমানভাবে। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের যাবতীয় উৎসবের পরিচালন-ভার এখন তাঁর উপরই ন্যস্ত।

এখনো রচনার বিরাম তাঁর নেই। বিভিন্ন পত্রিকায় এখনো তিনি তাঁর জীবনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রবন্ধের মাধ্যমে বিতরণ করে চলেছেন।

অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর অনেক রচনা বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার পাতায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো আছে, যথা—তত্ত্ববোধনী পত্রিকা, নব্য ভারত, প্রবাসী, শান্তিনিকেতন পত্র, বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি, বিশ্বভারতী পত্রিকা, দেশ, আনন্দবাজার।

বৃষ্টি থামে নি। একটু ধরেছে মাত্র। রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। তাঁর জীবন-কাহিনীর মাঝে মাঝে তাঁর পরিহাস ও সরস মন্তব্য শুনতে শুনতে সময়ের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম প্রায়; কিন্তু উঠতে হয় এবার। বৃষ্টি একটু ধরে আসতেই নেমে পড়লাম রাস্তায়; কবীর রোডের বর্ষা, চুয়াল্লিশ বছর আগের আষাঢ় মাসের বোলপুর স্টেশনের বৃষ্টির রাত্রিটার সঙ্গে এর কোনো যোগ আছে কিনা, তাই ভাবছিলাম।

রচিত গ্রন্থাবলী

কবীর। ৪ খণ্ড
দাদূ
জাতিভেদ
প্রাচীন ভারতে নারী
ভারতের সংস্কৃতি
বাংলার সাধনা
হিন্দু-সংস্কৃতির স্বরূপ

ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা

মধ্যযুগে ভারতীয় সাধনার ধারা

বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা

যুগগুরু রামমোহন

Medieval Mysticism of India.

গুজরাটি

চীন-জাপানো প্রবাস

শিক্ষনো ব্যাখ্যানো মালা

তন্ত্রণী সাধনা

হিন্দি

ভারতে জাতিভেদ

সংস্কৃতি সংগম

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

মানুষের জীবন হচ্ছে একটি বহতা নদী। কোথাও এর গতি হয় দ্রুত, কোথাও স্তিমিত। কখনোই বাঁধা-পুকুরের মত নিশ্চল হয়ে এ দাঁড়িয়ে থাকে না। কোনো কোনো নদী পাহাড় ডিঙিয়ে সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রান্তরে, সেখান থেকেই সমতল প্রান্তর পার হয়ে গড়িয়ে গেছে সাগরে। কিন্তু এমন নদীর সংখ্যা কম, এর সার্থকতাও সামান্য। পাথরের বিস্তর জাঙাল ভেঙে, সরু ঝরনার রূপে, উদ্দাম প্রাণবেগের তাড়নায় ঝিরঝির করে নেমে এসেছে একটা অজানা জলের ধারা, পথ না পেয়ে পাহাড়ের খাঁজে-খাঁজে পা ফেলে, বাধা-বন্ধন ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে অনেক দুরূহ সাধনায় অবশেষে পেয়েছে মাটির ছোঁয়া, পেয়েছে সমতলের স্পর্শ, তখন সে হয়েছে নদী, তখন সে পেয়েছে অকৃত্রিম স্রোত, এমন নদীর সংখ্যাই বেশি। কিন্তু এমন নদীকেও ব্যর্থ হতে হয়, পাহাড় থেকে প্রান্তরে আসার কঠোর সাধনাও নিষ্ফল হয়ে যায়, কত মরুপথে এমন কত নদী তার ধারা হারিয়ে ফেলেছে। সমতলের বুকের উপর দিয়ে গড়িয়ে যেতে যেতে নব নব দেশের নব নব বাতাসের নব নব জীবনের সংস্পর্শে এসে যে নদী স্রোতে উদ্দাম এবং তরঙ্গে উত্তাল হয়ে দুকূল উর্বর করে দিয়ে অবশেষে সমুদ্রে গিয়ে লীন হয়, সেই নদীই সফল নদী, সেই নদীই সার্থক নদী। সুরেন্দ্রনাথের জীবন ছিল এই নদীর মত।

২৩শে ডিসেম্বর ১৯৫২, ৮ই পৌষ ১৩৫৯ সাল। লখনউ এসে তাঁর জীবনের কাহিনী শুনছি। একটা অজানা জলের ধারার মতই তাঁর জন্ম, অনেক বাধা আর অনেক বিপত্তি ডিঙিয়ে নিজের প্রাণবেগের তাড়নায় তিনি এগিয়ে চলেছেন, বাধা যতই প্রবল হয় তাঁর প্রেরণাও প্রবল হয়ে ওঠে সেই

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

অনুপাতে। তার পর জীবন হয়ে এল সহজতর, তিনি সমতল প্রান্তর পার হয়ে এগিয়ে চললেন, জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় দিনে দিনে ঐশ্বর্যবান হয়ে— জীবনের সংস্পর্শে এসেছে যত ছাত্র, তিনি তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে চলেছেন স্বোপার্জিত জ্ঞানৈশ্বর্যের সার— উর্বর করে দিয়েছেন দুকূল। এই তাঁর জীবন।

স্টেশন থেকে আমিনাবাদের হোটেল। সেখান থেকে সাইকেল-রিকশা চেপে সটান চলে এসেছি ইউনিভার্সিটিতে। কড়া শীতের সকাল, তাজা রোদ্দুর উঠেছে। ঝরঝরে পিচের রাস্তা দিয়ে মসৃণ দ্রুততায় এগিয়ে চলেছে রিকশা। গানের দেশ লখনউ, এবং বাগান-বাগিচার। বাঁ-পাশে ভাতখণ্ডের সংগীতভবন, এপাশে-ওপাশে বাগিচায় নানা রঙের ফুল ফুটে আছে। একটু এগিয়ে যেতেই চড়াই। নীচে গোমতী নদী। সাঁকো পার হয়ে ঢালু পথে নেমে গেল রিকশা। ইউনিভার্সিটির গম্বুজ দেখা গেল। কয়েকটা ফটক ডিঙিয়ে পোস্টাফিসের ফটকে এসে নামলাম। বাদশাবাগ। সুলতানের বাংলো খুঁজে বার করতে একটু সময় লাগল। তবু সহজেই হল বলতে হবে। সুরেন্দ্রনাথ যদি তাঁর চিঠিতে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) পথের নির্দেশ দিয়ে না দিতেন তাহলে হয়তো খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্যই হত।

জীবনেব কোনো কাজে কোনো খুঁত না রাখাই ছিল তাঁর জীবনে সাফল্যলাভের মূলসূত্র। তিনি তাঁর শেষ চিঠিতেও তারই প্রমাণ দিয়ে গেছেন। দূরদেশ থেকে যে তাঁর কাছে আসবে, তার কোনো অসুবিধে না হয়, এই আন্তরিকতাটুকুও দেখায় ক'জন? তাঁর অবর্তমানে এই আন্তরিকতার অভাবটাই সবচেয়ে বড় লোকসান বলে মনে হল।

১৮৮৫ সালে কুষ্টিয়ায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেন ১৮৮৭, কিন্তু এটা নাকি ভুল। পিতা কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত ছিলেন কানুনগো। মাসিক বেতন পেতেন পঞ্চাশ টাকা। পিতার এই সামান্য বেতনে

সংসারে সচ্ছলতা ছিল না। অতি দরিদ্রভাবে জীবন আরম্ভ হয়। পিতা নানা জায়গায় বদলি হতেন। তাঁর সঙ্গেসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথেরও স্থানবদল হত।

তাঁর বয়স যখন দুই-তিন বৎসর তখনই তাঁর জীবনে অস্বাভাবিক শক্তির লক্ষণ দেখা যায়। অক্ষর-পরিচয় তখনো তাঁর হয়নি, কিন্তু এ সত্ত্বেও রামায়ণ পাঠ করতে পারতেন। এমনকি 'কাঞ্চন' কথাটির অর্থ পর্যন্ত বলে তিনি সকলকে চমৎকৃত করে দেন। এই সময় তাঁর খেলার জিনিস ছিল অতি ক্ষুদ্র একটি কৃষ্ণের মূর্তি এবং সেই অনুপাতেরই একটি ছোট ভোগের পাত্র।

একটি শিশুর এই ভক্তিভাব দেখে এবং তার এই অস্বাভাবিক ক্ষমতা দেখে সকলে আশ্চর্য হয়ে যায়। একদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে দেখা করানো হয় এই শিশুটিকে। বিজয়কৃষ্ণ এঁর সঙ্গে কথা বলে অভিভূত হন, বলেন, এ এক জাতিস্মর বালক। এর পর সুরেন্দ্রনাথের নাম হল 'খোকা ভগবান'। খোকা ভগবানের কথা রাষ্ট্র হয়ে গেল চারদিকে। দলে দলে লোকজন আসতে লাগল তাঁর কাছে। নানাজনের নানা প্রশ্ন। লোকের আনাগোনার বিরাম নেই। একটি শিশুর জীবন একটা বিরাট জনতার দ্বারা জীর্ণ হয়ে যেতে লাগল।

নেহাত কাহিনী বলে এই ঘটনাকে উড়িয়ে দেওয়া হয়তো যেত। কিন্তু এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। সে আমলের সংবাদপত্রে এই কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে।

১৩০১ সনের ৭ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৯শে এপ্রিল ১৮৯৪ তারিখের 'সুলভ দৈনিক' সংবাদপত্রে "অদ্ভুত বালক" শিরোনামায় এইরূপ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে—

"ইংরেজি সংবাদপত্র 'হোপে' একটি অদ্ভুত বালক সম্বন্ধে একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রকাশিত হইতেছে, তাহা যথাযথ প্রকাশ করা গেল—

"সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত নামক একটি সপ্তম [নবম ?] বর্ষীয় বৈদ্য বালকের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। বালক বিদ্যালয়ে আখ্যান-মঞ্জরী ও ইংরেজি বর্ণমালা পাঠ করে, সংস্কৃত এখনও পড়িতে শিখে নাই; কিন্তু তাহাকে ধর্ম ও দর্শনের সম্বন্ধে যে-কোনো প্রশ্ন করা যাউক না কেন, তৎক্ষণাৎ তাহার যথাযথ উত্তর দিয়া বড় বড় দার্শনিককেও বিস্মিত করিয়া দেয়। সম্প্রতি বালককে বেঙ্গল থিয়সফি সোসাইটির গৃহে নানা লোকে নানাপ্রকার কূট প্রশ্ন করে, সেই সকল প্রশ্নের উত্তর বালক দিয়াছে…"

এর পর নানা প্রশ্ন এবং তার উত্তর প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি বাহুল্য ভয়ে এখানে উদ্ধৃত করা হল না।

অশেষ ক্ষমতা নিয়ে তিনি যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এর থেকেই তা সহজে বোঝা যায়।

কিন্তু এই প্রশ্ন ও উত্তরের ভিড়ের মধ্যে যদি এঁকে ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে লেখাপড়ার এঁর বাধা হবে—তাঁর পিতার এই ভয় হল। তাঁর পিতা বদলী হলেন ডায়মণ্ডহারবারে। সুরেন্দ্রনাথের জীবনে এল নূতনতা। একটি জনতার দেশ থেকে তিনি এসে পৌছলেন যেন একটি জনহীনতার রাজ্যে। তিনি নাকি বলেছেন যে, তাঁর জীবনের এই সময়টা সবচেয়ে নিঃসঙ্গ ও নিরুত্তাপ ভাবে কেটেছে।

সুরেন্দ্রনাথের আদি নিবাস বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামে। তাঁর প্রপিতামহ কবীন্দ্র মদনকৃষ্ণ দাসগুপ্ত বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পারি-বারিক টোল ছিল। ন্যায় কাব্য সাংখ্য আয়ুর্বেদ ইত্যাদি সেখানে পড়ানো হত। এই টোলে মুসলমান ছাত্রেরাও আয়ুর্বেদ পড়ত। গৈলা কবীন্দ্র-বাড়ি বলেই এঁদের গৃহের পরিচয়। এই গৃহে সর্বদা চলত জ্ঞানযজ্ঞ। এই টোল সেদিন পর্যন্তও টিঁকে ছিল, কিন্তু বাংলাদেশ বিভক্ত হবার পর পূর্ববঙ্গ থেকে বহুলোক চলে আসায় বর্তমানে টোলের অবস্থা নিষ্প্রভ হয়েছে।

এখন এই টোল কবীন্দ্র-কলেজ নামে অভিহিত। এই টোলে বরাবরই সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর পিতার একমাত্র সন্তান। তাঁর প্রপিতামহের লোকান্তরের বহুদিন বাদে তাঁর জন্ম। কিন্তু বালক সুরেন্দ্রনাথের অদ্ভুত প্রতিভা দেখে অনেকেই সেকালে বলাবলি করতেন যে, কবীন্দ্র আবার বুঝি ফিরে এলেন।

ডায়মণ্ডহারবারে অবস্থানকালে যখন তাঁর দিন নিঃসঙ্গ কাটছে, তখন তাঁর বয়স নয়-দশ। এই সময় বৃত্রসংহারের অনুকরণে তিনি রচনা করেন এক মহাকাব্য— প্রায় চারটি সর্গ রচনা করেন। তাঁর হাতের লেখা ভালো ছিল না বলে তিনি এই কাব্য মুখে মুখে বলে যান, আর তাঁর এক সহপাঠী লেখেন।

তাঁর পিতা বদলী হলেন কৃষ্ণনগরে। সুরেন্দ্রনাথ এখানে এসে ভর্তি হলেন স্কুলে। নূতন এই অদ্ভুত বালককে পেয়ে সহপাঠীরা জ্বালাতন করতে শুরু করল, নানাভাবে তারা উপদ্রব আরম্ভ করল, কথায় কথায় তাঁর মাথায় চাঁটি মেরে মজা পেত তারা। এখান থেকেই ১৯০০ সালে প্রথম ডিভিশনে তিনি এনট্রান্স পাশ করেন। এনট্রান্স পাশ করে তিনি যান দেশে—গৈলায়। সেখানে গিয়ে টোলে যোগ দেন। এখানে তিনি পঞ্জী ও টীকাসহ দুরূহ কলাপব্যাকরণ ছাত্রদের পড়াতে আরম্ভ করলেন, নিজেও পড়তে লাগলেন।

পুনরায় আসেন কৃষ্ণনগরে। এখানকার কলেজ থেকে এফ. এ. পাশ করেন। এফ. এ. পড়ার সময় কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপকের সঙ্গে তাঁর লড়াই বাধে। সুরেন্দ্রনাথ নানাবিধ প্রশ্নের দ্বারা অধ্যাপককে বিব্রত করে তোলেন। অধ্যাপক দেখলেন, ক্লাসে যা পড়ানো হয় সুরেন্দ্রনাথ তার চেয়ে অনেক এগিয়ে আছেন। অগত্যা অধ্যাপক কলেজ লাইব্রেরি

থেকে ‘সিদ্ধান্ত-কৌমুদী’ ছাত্রদের বন্ধ করে ইশু করা দেবার ব্যবস্থা করলেন।

এই সময় তিনি সংস্কৃতে অনুষ্টুভ্ ছন্দে একটি কাব্য রচনা করেন—তিলোত্তমা কাব্য।

এক বছর বি. এ. ফেল ক'রে পর বৎসর কলকাতার রিপন কলেজ থেকে তিনি সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেন। নিস্তারিণী বৃত্তি পান। বি.এ. ক্লাসে ইংরেজি পড়াতেন টি. এল. ভাসানি। একদিন ভাসানি শেক্‌স্‌পীয়র পড়াচ্ছেন, সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে অনবরত নানা রকমের প্রশ্ন করছেন। সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া অধ্যাপকের পক্ষে সম্ভবপর হয় না, অধ্যাপক ভাসানি রেগে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যান। দু-একদিন পরে ভাসানি সুরেন্দ্রনাথকে ডেকে সস্নেহে বলেন, তুমি যা জানতে চেয়েছিলে, সে প্রশ্ন সংগত প্রশ্ন।

সে সময়ে বি. এ.-তেও বিজ্ঞান পড়তে হত। সুরেন্দ্রনাথ কেমিস্ট্রি আদ্যোপান্ত মুখস্থ করেন। ক্লাস-পরীক্ষার খাতায় তিনি কমা-সেমিকোলন সমেত হুবহু বইয়ের কথা লেখেন। অধ্যাপক খাতা দেখে চটে যান, বলেন, এ নিশ্চয় নকল করা। সুরেন্দ্রনাথ এ অভিযোগ অস্বীকার করলে অধ্যাপক বই খুলে তাঁকে মুখস্থ বলতে বললে তিনি অনর্গল মুখস্থ বলে অধ্যাপককে বিস্মিত করেন। এই ব্যাপারে তাঁর প্রতি অধ্যাপক এতটা আকৃষ্ট হন যে, কোনোদিন সুরেন্দ্রনাথ ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে অধ্যাপক বলতেন, তাহলে আজ আমরা ক্লাস না নিলাম।

বি. এ. পাশ করে জীর্ণ বস্ত্রে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অর্থের খুব প্রয়োজন। অনটন অত্যন্ত। এই সময় তিনি পেলেন একটি প্রাইভেট টিউশন। টানাটানি ছিল, কিন্তু আত্মমর্যাদাজ্ঞানও ছিল সেই সঙ্গে। টিউশনের বাড়িতে তিনি দেখলেন, তাঁর মর্যাদায় আঘাত লাগছে তাদের ব্যবহারে। তিনি ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন।

সংস্কৃত কলেজে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হলেন সুরেন্দ্রনাথ। অলংকার ও দর্শন শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। অনেকে এইসব শাস্ত্র আলোচনার জন্য তাঁর কাছে আসত।

তার অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, "কলেজে পড়িয়া কোনো দিন বিশেষ আনন্দ পাই নাই। টোলের পড়ুয়াদের সরল জীবনযাত্রার সঙ্গে আমার জীবন সেই সময় এমনই গাঁথিয়া গিয়াছিল যে, আজও তাহার ছবি মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করিতেছে।"

এম. এ. ক্লাসের পাঠ শেষ ক'রে তিনি পরীক্ষা দিলেন। "আমার পিতা তখন মুর্শিদাবাদ লালবাগে স্বল্প বেতনের একটি চাকুরি করিতেন। সংস্কৃত কলেজ হইতে ১৯০৮এ সংস্কৃতে এম. এ. পাশ করিয়া লালবাগে পিতার আশ্রয়ে বাস করিতেছি। আমাদের সে সময়ে কলেজে চাকুরি পাওয়া ভারী কঠিন ছিল। কলেজের সংখ্যা ছিল কম এবং তদনুপাতে পদপ্রার্থীও কম ছিল না। পাশ করিয়া যে চাকুরির চেষ্টা করিব এমন কোনো সুযোগ ছিল না। ..তখন পূর্ববঙ্গ ও আসাম একটা স্বতন্ত্র প্রদেশ হইয়াছে। আমাদের বাড়ি পূর্ববঙ্গে, তাই পূর্ববঙ্গে কোনো ডেপুটিগিরি চাকরি পাওয়ার জন্য একটু চেষ্টা করিলাম।"

তাঁদের বাড়ির টোল পরিদর্শনের ও পারিতোষিক বিতরণের জন্যে প্রতি বৎসর জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট আসতেন। সেবার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন রীড নামে এক সাহেব। "রীড সাহেবকে তাঁর মোটর-লঞ্চ হইতে আমাদের বাড়ী পর্যন্ত আনার ভার পড়িল আমার উপর। তাঁর লঞ্চ থামিত আমাদের বাড়ী হইতে তিন মাইল দূরে। আমরা দুইজনে এই পথ মাঠের মধ্য দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে আসিলাম। রীড সাহেব বিলাতে কিছু সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন। পথশ্রান্তি দূর করিবার জন্য সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিলাম। রীড সাহেবও তাঁর পূর্ব-পঠিত 'নল-চরিতে'র নানা

শ্লোক ইংরেজি রকমের গদ্‌গদ্ উচ্চারণে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। কি কারণে জানি না, আমাকে রীড সাহেবের বেশ ভালো লাগিয়াছিল। তিনি দুইবার আমাকে বিলাত যাইবার জন্য সরকার হইতে স্টেট স্কলারশিপের ব্যবস্থা করিয়া টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন।"

পিতার একমাত্র সন্তান তিনি। এই প্রস্তাবে তাঁর পিতা বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। তাঁকে এতদিন দূর বিদেশে রাখার কল্পনায় তাঁর পিতার মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। বিলাত যাওয়ার কথায় সুরেন্দ্রনাথের মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, কিন্তু পিতার মানসিক অবস্থা কল্পনা করে তাঁর উৎসাহ দ'মে যায়। "বিলাত যাইয়া বড় হইব, অনেক অর্থ উপার্জন করিব, এ রকম একটা উচ্চাভিলাষ আমার মনের মধ্যে কখনোই জাগিয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। আমি দরিদ্রের পুত্র, দরিদ্রভাবে লালিত-পালিত, বড় বড় সৌভাগ্যের স্বপ্ন আমার মধ্যে কখনোই আসিত না।"

বিলাত যাওয়ার কথা চাপা পড়ে গেল। কিন্তু উপার্জনের জন্যে কিছু একটা করতে হয়। এবার কর্মজীবনে প্রবেশের জন্যে উদ্যোগী হয়েছেন সুরেন্দ্রনাথ। "যখন ডেপুটিগিরির চেষ্টায় নামিলাম তখন আমার রীড সাহেবের কাছেই যাইতে হইল। তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে আমাকে নির্বাচিত করিয়া ঢাকায় গিয়া কমিশনার হন এবং ঢাকা হইতে আমাকে প্রথম ব্যক্তি নির্বাচিত করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার সহিত যখন আমার আলাপ-আলোচনা হয় তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কি এখন বেকার হইয়া চাকুরির চেষ্টা করিতেছ, না, আর কিছু করিতেছ?' ইংরেজি দর্শনে এম. এ. পড়িবার আমার একটা ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। তথাপি বেকার বসিয়া আছি এবং চাকুরি খুঁজিতেছি, এ কথা বলিতে কেমন লজ্জা করিতে লাগিল, আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, 'আমি এবার ইংরেজি দর্শনে এম. এ. দিব।' তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'তোমার

লেখাপড়ার প্রতি যেরূপ অনুরাগ তাহাতে তোমার শিক্ষাবিভাগের কাজ লওয়া উচিত।' আমি বলিলাম, 'শিক্ষা বিভাগে কাজ দেয় কে?' তখন পূর্ববঙ্গে ডিরেক্টর ছিলেন শার্প সাহেব। রীড সাহেব তৎক্ষণাৎ শার্প সাহেবের নিকট আমাকে এক পরিচয়পত্র দিলেন। শার্প সাহেবের সঙ্গে দেখা করায় তিনি বলিলেন, 'চাকুরি তো এখন কোথাও খালি নাই, তবে রাজসাহীতে অল্পদিনের জন্যে একটা কাজ খালি আছে, বেতন ১০০৲ টাকা।' আমি বলিলাম, 'আমি ১০০৲ টাকার চাকুরি লইব না, ১৫০৲ টাকা হইলে লইতে পারি।' সেদিন শার্প সাহেবের সঙ্গে আলোচনা এই পর্যন্তই হয়।"

রীড সাহেবকে তিনি বলেন যে, দর্শনে এম. এ. দেবেন। এই কথা সত্য করার জন্যে বহরমপুর থেকে বই আনিয়ে পর বৎসর অর্থাৎ ১৯১০ সালে পরীক্ষা দিয়ে ইংরেজি দর্শনে এম. এ. পাশ করেন।

এবার কর্মজীবন শুরু হল সুরেন্দ্রনাথের। তিনি তিন মাসের জন্যে রাজসাহী কলেজে যোগ দেন। এখানে তিনি এলেন— পরনে পুরাতন দেশী পরিচ্ছদ। ছেলেরা তাঁর এই সাজ দেখে হাসতে লাগল।

তার পর অশ্বিনীকুমার দত্তের আহ্বানে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে যোগদানের জন্যে যান। বরিশাল ঘাটে এসে শার্প সাহেবের লঞ্চ থামে। খবর যায় সুরেন্দ্রনাথের কাছে—অবিলম্বে তাঁকে চট্টগ্রাম কলেজে যোগদান করতে হবে।

ডেপুটিগিরি তিনি পান নি, এটা একটা আশীর্বাদ। তিনি শিক্ষকতার দিকে এলেন, এইটেই তাঁর পথ। এই পথ পেয়ে দ্রুত তিনি ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে লাগলেন। সমতল-দেশে পৌঁছে খরস্রোতে বয়ে চলল তাঁর জীবন-নদী।

১৯১১ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত তিনি চট্টগ্রাম গবর্নমেণ্ট কলেজে সংস্কৃত ও বাংলার সিনিয়র প্রফেসার রূপে কাজ করেন। ১৯২০ থেকে

১৯২২ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার ছিলেন। ১৯২২ সালে তিনি চট্টগ্রাম কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল হন। দুই বছর পরে ১৯২৪ সালে আই. ই. এস. হয়ে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজি দর্শনের প্রধান অধ্যাপক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের লেকচারার পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩১ সালে গবর্নমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হন। দশ বছর এই পদে তিনি সগৌরবে কাজ করেন। ১৯৪২ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিবিজ্ঞান অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

এর পর তিনি বিদেশে যান। ১৯৫০ সালে বিদেশ থেকে ফিরে লখনউতে বাস করছিলেন।

১৯১১ থেকে ১৯৪৫— একটানা পঁয়ত্রিশ বৎসর তিনি তাঁর জীবনকে লিপ্ত রেখেছিলেন কাজের মধ্যে। কিন্তু এরই মধ্যে জ্ঞানান্বেষণা তাঁর থামেনি। এর বিরাম ছিল না। অধ্যাপনার সঙ্গে নিজের অধ্যয়নও একই সঙ্গে চলেছে। ভারতবর্ষের সীমানা পার হয়ে তাঁর খ্যাতি পৌঁছেছে দূর বিদেশেও। পিতার মনোকষ্টের হেতু না হবার জন্যে যে বিলাত একবার প্রথমজীবনে বাতিল করেছিলেন, সেই ইঙ্গ-ভূমি তাঁকে সম্মানে ভূষিত করেছে।

১৯২০ সালে তিনি ভারতীয় দর্শনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি. হন, ১৯২২ সালে ইংরেজি দর্শনে ডি. ফিল. হন কেম্ব্রিজের। ১৯৩৯ সালে রয়াল ইউনিভার্সিটি অব রোম তাঁকে ডি. লিট. উপাধি দান করেন।

ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালরের এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। এ ছাড়া বিভিন্ন দেশ তাঁকে নানাবিধ উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেছে—সে এক দীর্ঘ তালিকা।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সঙ্গেসঙ্গে তিনি গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন— ব্রাউনিঙ ও বের্গসঁ, বেদান্তের বাস্তবতা, নির্বাণের তাৎপর্য, তন্ত্রের দর্শন, ভারতীয় সংস্কৃতির অর্থ, ক্রোচে ও বৌদ্ধধর্ম ইত্যাদি।

তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা পাঁচ খণ্ডে সমাপ্য ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস গ্রন্থ। এই গ্রন্থ পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত হয়েছে। চারটি খণ্ড ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীজওহরলাল নেহরুর ব্যক্তিগত অনুরোধে তিনি পঞ্চম খণ্ড রচনা আরম্ভ করেছিলেন, প্রায় অর্ধেক লেখাও, হয়েছে। এই বই তিনি আর শেষ করতে পারলেন না।

বাংলা থেকে অনেক দূরের মাটি। ছয় শ' মাইলের উপর। এত দূরে এসেছি যাঁর জীবনের কাহিনী জানতে, যদি তাঁর নিজের মুখ থেকেই সে-কাহিনী শোনা যেত—তা হলে দীর্ঘপথের এই ক্লান্তি,আর ক্লান্তি বলে মনে হত না নিশ্চয়। ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। সূর্য তখন সোজা মাথার উপর। রোদ তবু তাতে নি, কিন্তু মনটা যেন তেতে উঠেছে। একটা অজানা জলের ধারা নিজের প্রাণের আবেগে কী ভাবে একটা বিশাল নদী হয়ে উঠতে পারে, সেই কাহিনী শুনে এলাম এক্ষুনি, মন তাই চাঙ্গা ঠেকতে লাগল।

আবার সাইকেল-রিকশা, হোটেল অভিমুখে। নীচে ওই গোমতী নদী নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে, শীতের দুপুরে গা এলিয়ে যেন রোদ পোয়াচ্ছে। হাসি পেল, নামেই নদী, কিন্তু নদীত্ব নেই এতটুকু। বাদশাবাগ পিছনে ফেলে চলে এলাম। তাতে ক্ষতি নেই কিছু, পথের দু ধারে ফুল-বাগিচা, নানা রঙের পাখা মেলে দিয়ে তারা রোদ মাখছে।

রচিত গ্রন্থাবলী

দার্শনিকী। প্রবন্ধ

রবি-দীপিতা। রবীন্দ্র-কাব্য আলোচনা

সাহিত্য-পরিচয়। প্রবন্ধ

কাব্য-বিচার। অলংকারশাস্ত্র

তত্ত্বকথা। ধর্মশাস্ত্র আলোচনা

আয়ুর্বেদ। ভারতীয় ভেষজশাস্ত্র আলোচনা

ক্ষণলেখা। কাব্যগ্রন্থ

নিবেদন। কাব্যগ্রন্থ

বিজয়িনী। কাব্যগ্রন্থ

চারণী। কাব্যগ্রন্থ

চারণ। কাব্যগ্রন্থ

সৌন্দর্যতত্ত্ব। প্রবন্ধ

ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা। প্রবন্ধ

প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা। প্রবন্ধ

অধ্যাপক। উপন্যাস

ইংরেজি

A History of Indian Philosophy. 5 vols.

A Study of Patanjali.

Yoga Philosophy in relation to other Systems of Indian Thought.

Yoga as Philosophy and Religion.

Hindu Mysticism.

Indian Idealism.

A History of Sanskrit literature (Classical Period).

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

কাশী। কাশীতেই চলেছি। কিন্তু কাশী স্টেশনে নামলাম না। নামলাম বেনারসে—বারাণসীতে। একদিকে বরুণা, আর একদিকে অসী, এই নিয়েই বারাণসী।

একটু আগে কাশী দেখেছি। ট্রেন তখন ছিল গঙ্গার ব্রিজের উপর। অর্ধবৃত্তাকার গঙ্গার স্বচ্ছ ধারার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে অগণিত মন্দিরের মিছিল। মনে হয়েছিল, এ শহর কেবলই হয়তো মন্দিরে গড়া। কিন্তু তা নয়। এখানে আছে মন্দির, আর আছে মানুষ। এই বারাণসী। পোরবন্দর থেকে ব্রহ্মপুত্র, কাশ্মীর থেকে কুমারিকা— এই বিরাট ভারত-ভূমিতে কত বিভিন্ন ভাষা, কত বিভিন্ন অধিবাসী, কত বিভিন্ন ধর্ম; সর্বসমন্বয়ের মহাতীর্থ এই মহাদেশ, এই ভারতবর্ষ। ভারতের সর্বপ্রান্ত থেকে নিজ ভাষা ও ধর্ম, সমাজ ও সংস্কার নিয়ে এই বারাণসীতে এসে পাশাপাশি বাস করছে বিভিন্ন মতাবলম্বী মানুষ। এ হচ্ছে ভারতেরই সংহত সংক্ষিপ্তসার, এ হচ্ছে ভারতেরই নির্যাস— অণু-ভারতভূমি। ভারতের ধর্মধানী ও পাণ্ডিত্যের মহাদুর্গ বলে কীর্তিত হয়েছে এই পীঠস্থান। যাবনিক অত্যাচারে খর্ব হয়নি এর মহিমা, বিশ্বনাথের মন্দিরের পাশেই স্থান পেয়েছে মসজিদের মিনার। উপকণ্ঠস্থ সারনাথের মৃগদাব কানন ভস্মীভূত হয়েছে, পুনরায় সব ভস্ম সরিয়ে জেগে উঠেছে পুরাতন কীর্তি। যে উন্নত মন্দির-চূড়া অত্যাচারীর আঘাতে চূর্ণ হয়েছে, সে চূড়া পুনরায় আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে নি বটে, কিন্তু অনুন্নত চূড়াবলম্বী সেই মন্দির মর্যাদায় আজো অভ্রভেদী। সহিষ্ণুতার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বারাণসী, ভারতের প্রতিনিধি-রূপে। এই পীঠস্থানে এসেছি তীর্থে— মনীষী-সন্দর্শনে।

সুখদাসুন্দরী। তিনিও শৈশবে পিতৃমাতৃ-স্নেহ পান নি। জন্মাবার কিছুদিন পর থেকেই তিনিও অন্যগৃহে লালিত-পালিত।”

১৮৮৫ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স প্রবর্তিত হয়। সেই বছর তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠনাথ কবিরাজ প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে সংস্কৃত অনার্সসহ বি. এ. পাশ করেন। এরই বছর দুই পরে অকালে তিনি মারা যান। পিতৃহীন গোপীনাথ মাতার স্নেহে ও মমতায় লালিত হতে লাগলেন। পিতার মাতুলালয় কাঁঠালিয়াতে ও নিজের মাতুলালয় ধামরাইয়ে তিনি তাঁর বাল্যের শিক্ষা সমাপ্ত করলেন।

“ধামরাই থাকা কালেই আমি আমার সাহিত্যিক জীবনের একটি জীবন্ত আদর্শ প্রাপ্ত হই। ইনি ধামরাই-নিবাসী শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত। আমি যখন ধামরাই স্কুলে পড়ি, তখন ইনি ঢাকা কলেজে পড়তেন। মাঝে মাঝে প্রায়ই বাড়ি আসতেন। তখন তাঁর সঙ্গসুখ অনুভব করতাম ও তাঁর কাছ থেকে বহু বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতাম। বাংলা ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল, ব্যুৎপত্তিও ছিল অগাধ। সিদ্ধান্তকৌমুদী তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। আমি রবীন্দ্রসাহিত্যের আস্বাদ প্রথমে তাঁর কাছে থেকেই লাভ করি। তিনিই আমাকে সর্বপ্রথম মোহিত সেনের সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের ‘কাব্যগ্রন্থ’ কিনে দেন। আজ তিনি আমার ধর্মজীবনে গুরুভ্রাতা। তারপর আসি ঢাকায়। সেখানে জুবিলি স্কুলে ভর্তি হই। এখানে আমাদের হেডপণ্ডিত ছিলেন রজনীকান্ত আমিন—ইনি আমার জীবনে সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তির বীজমন্ত্র দেন বলা চলে। এঁর কাছে পড়ি পাণিনি ও সিদ্ধান্তকৌমুদী। আমার নৈতিক জীবনের আদর্শ লাভ বিশেষভাবে যাঁর কাছ থেকে, তিনি ঐ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক মথুরাবাবু, ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ মথুরামোহন চক্রবর্তী। তা ছাড়া, জুবিলি

স্কুলের অন্যতম শিক্ষক নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের নৈতিক জীবনের প্রভাবও আমার উপর কম পড়ে নি।”

ঢাকার জুবিলি স্কুল থেকে ১৯০৫ সালে তিনি এনট্রান্স পাশ করেন। বাল্যজীবনেই সংস্কৃত শিক্ষার আকর্ষণ লাভ করা গিয়েছে এবং নৈতিক জীবনের আদর্শও; এবার প্রয়োজন উচ্চতর শিক্ষার। কিন্তু পিতৃহীন যুবকের জীবনে এবার দেখা দিল কঠিনতর সঙ্কট। উচ্চশিক্ষালাভ করার মত আর্থিক সঙ্গতি নেই। পিতার মাতুল ছিলেন কিছুটা সহায়, তিনিও কিছুদিন পূর্বে পরলোকগমন করেছেন।

এনট্রান্স পাশ করার পর পুনঃ পুনঃ ম্যালেরিয়ায় ভুগে তাঁর এক বৎসর সময় নষ্ট নয়। তাই ১৯০৫ সালে কলেজে ভর্তি হতে পারেন নি।

বললেন, “পর বৎসর, ১৯০৬ সালে কলকাতায় আসি। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন। কলকাতায় এসে তাঁর সঙ্গে দেখা। তিনি আমাকে কলকাতায় পড়ার পরামর্শ দিলেন।”

কিন্তু তাঁর ভয় হল ম্যালেরিয়ার। বাংলা দেশটাই তখন ম্যালেরিয়ায় ভরা ছিল। তাই তিনি পশ্চিমে যেতে ইচ্ছা করলেন। কাছে-ভিতে কোথাও না, মধুপুর-জসিদি বা সাসারম নয়।

বললেন, “যাই জয়পুরে। হিন্দী জানিনে, কাউকে চিনিনে। জীবনে সে একটা অ্যাডভেঞ্চার। আর, আসলে এই অ্যাডভেঞ্চারের ঝোঁকটাই আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল এত দূরে। তা ছাড়া, রাজস্থানের প্রাচীন গৌরবের আকর্ষণ ত ছিলই। তখন যে স্বদেশী-আন্দোলনের যুগ।”

কিন্তু সহায় একটা জুটে যায়ই। উদ্যোগী যে, তার জীবনের কোনো সঙ্কটই সঙ্কট নয়। এখানে এসেও গোপীনাথ সহায় পেয়ে গেলেন।

“রাও বাহাদুর সংসারচন্দ্র সেন তখন জয়পুর স্টেটের প্রধানমন্ত্রী। সংসার-বাবুর বড় ছেলে অবিনাশবাবুর দুই ছেলের প্রাইভেট টিউটার হয়ে সেখানে

গোপীনাথ সংস্কৃতজ্ঞ মহাপণ্ডিত বলে খ্যাত হয়েছেন। সংস্কৃত সাহিত্য-সিন্ধুমন্থন করেছেন তিনি। কিন্তু বাল্যজীবনে তাঁর অনুরাগ ইংরেজি সাহিত্যের প্রতিও কম ছিল না। ছাত্রজীবনে তিনি বিভিন্ন ইংরেজ কবির রচনা পাঠ করতেন। গদ্যের মধ্যে এমারসন তাঁর প্রিয় ছিল।

"শেলি কীটস পড়ি, কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগত ওয়ার্ডসওয়ার্থ। ওয়ার্ডসওয়ার্থ নিয়েই মেতে থাকি। সহপাঠীদের পড়ে শোনাই। স্কুল থেকেই বায়রন স্কট শেলি কীটস সংগ্রহ করেছিলাম। চসার থেকে টেনিসন অবধি—সব।"

সঙ্কীর্ণ শক্তির অধিকারী নন, তাই তাঁর আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা পাখা মেলে দিয়ে উড়তে চাইত। যখনই যেখানে পেতেন একটি আশ্রয়-প্রশাখা, তখনই তার উপর ভর দিয়ে বিশ্রাম করে নিতেন। জয়পুরে যখন মেঘনাথ-বাবুর সংসর্গে এসে বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহী অনুরাগী হয়েছেন, ঠিক তখনই নবকৃষ্ণবাবুর সঙ্গে তিনি গভীরভাবে ইংরেজি সাহিত্যের রসাস্বাদনে ব্যস্ত। আবার এই সময়ই তাঁর দৃষ্টি পড়ে অন্যত্রও।

"জয়পুর সাধারণ গ্রন্থাগারে ও ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী কান্তি মুখোপাধ্যায়ের বিশাল গ্রন্থালয়ে বসে বসে পড়তাম। বই ঘাটতে ঘাটতে ভারতের প্রত্নতত্ত্বের দিকে আমার দৃষ্টি পড়ে। তখন নিভৃত লাইব্রেরী-কক্ষে বসে আমি প্রত্নতত্ত্বান্বেষণ করতাম। আর করতাম প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অনুশীলন। কান্তিবাবুর সংগ্রহ এই বিষয়ে সমৃদ্ধ ছিল।"

জয়পুরে চার বছর কাটিয়ে সেখান থেকে তিনি বি. এ. পাশ করলেন। তারপর এলেন কলকাতায়। কলকাতায় এসে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সঙ্গে দেখা করলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ গোপীনাথকে পালিতে এম. এ. পড়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কলকাতা সম্বন্ধে গোপীনাথের আতঙ্ক আছেই—

ম্যালেরিয়াতঙ্ক। কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করায় তাই তিনি মনে মনে সায় দিতে পারলেন না।

বেয়াল্লিশ বছর আগে, ১৯১০ সালে, তিনি প্রথম কাশীতে আসেন। এই কাশীই তাঁর জীবনের ধারা নিয়মিত করেছে বলা চলে। জীবনে তিনি মনোমত একটা গতি লাভ করলেন এখানে, যে গতি তাঁর জীবনে এখনো অব্যাহত। ঢাকায় জুবিলি স্কুলের হেডপণ্ডিতমহাশয় তাঁর জীবনে বিদ্যার যে বীজ উপ্ত করেছিলেন সেই বীজ থেকে ইতিমধ্যে অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল, এবার কাশীতে এসে তা সফল মহীরুহে পরিণত হবার উপযুক্ত উর্বর ক্ষেত্র লাভ করল।

ডক্টর আর্থার ভেনিস তখন কাশীর কুইন্‌স কলেজের সংস্কৃত ও ইংরেজি শাখার প্রিন্সিপাল। এই কলেজে এম. এ. পড়ার জন্যে গোপীনাথ এলেন। কিন্তু কোন্ বিষয়ে তিনি এম. এ. পড়বেন, তা তিনি তখনও স্থির করে উঠতে পারেন নি। তাঁর অনুরাগ তখন ছিল ত্রিধারায় বিভক্ত। জয়পুরের লাইব্রেরীতে বসে তিনি প্রত্নতত্ত্বের বই ঘেঁটে ভারতীয় ইতিহাসের প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন; আর ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি তাঁর টান ছিলই; সেই সঙ্গে ঢাকা জুবিলি স্কুলের হেডপণ্ডিত মহাশয়ের শিক্ষাটাও তাঁর মনে আছে। দর্শনে অনুরাগ ছিল অবশ্য তাঁর স্বভাবসিদ্ধ।

এই তিনটি ধারার মধ্য থেকে একটি ধারা বেছে নেওয়ায় তাঁকে সাহায্য করলেন অধ্যাপক ভেনিস। তাঁর খাস-কামরায় গোপীনাথকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তিনি তাঁকে পরামর্শ দিলেন। গোপীনাথের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তিনি অবশ্যই বুঝতে পেরেছিলেন গোপীনাথের প্রবণতা কোন্ দিকে সবচেয়ে বেশি। ভেবে-চিন্তে ভেনিস বললেন, সংস্কৃত নিতে। আরো বললেন, বামাচরণ ন্যায়াচার্য (পরে মহামহোপাধ্যায়) তাঁকে পড়াবেন।

বামাচরণ বিচক্ষণ পণ্ডিত। তাঁর কাছে ন্যায় ও বেদান্তের পাঠ গ্রহণ করবেন জেনে গোপীনাথ উৎসাহিত হলেন এবং ভেনিসের কথায় রাজি হয়ে সংস্কৃত নেওয়াই স্থির করে বসলেন।

যে-স্রোত ছিল তিনটি ধারায় বিভক্ত, সেই মুক্তবেণী এবার একত্র হল যুক্তবেণীতে। গোপীনাথ জীবনে নূতন আবেগের সঞ্চার বুঝতে পারলেন এবং সেইদিন থেকেই তিনি সেই বেগে জীবনকে অগ্রসর করে নিয়ে চলেছেন।

ভেনিস তাঁকে আরও পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন যে, এম. এ.র ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে গবেষণা করতে হবে, সেইজন্যে বিদেশী ভাষা শিক্ষা করাও দরকার, জার্মান ও ফ্রেঞ্চ পড়াও কর্তব্য। সঙ্গেসঙ্গে প্রাকৃত ও পালি শিক্ষারও ব্যবস্থা হল। ভেনিসের উপদেশ শিরোধার্য করলেন গোপীনাথ। অধ্যাপক নর্মান এ বিষয়ে তাঁকে বেশি সাহায্য করেছেন।

১৯১৩ সালে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি নূতন ইতিহাস রচনা করলেন। ইতিপূর্বে কেউ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর কৃতিত্ব অর্জন করে এম. এ. পাশ করে নি। এম. এ. পাশ করে এক বছর গবেষণাবৃত্তি লাভ করে তিনি কাশীর কুইন্‌স কলেজেই থাকেন।

এই তাঁর ছাত্রজীবন। স্কুল-কলেজের সাধারণ ছাত্রজীবন এইখানেই তাঁর শেষ হল বটে, কিন্তু প্রকৃত ছাত্রজীবন যাকে বলা যায়, তার ইতি হল না। তার ইতি হল না বলেই গোপীনাথ কবিরাজ আজ সুধীমহলে সম্মানের সু-উচ্চ আসন লাভ করলেন।

কুইন্‌স কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরস্বতী-ভবন ১৯১৪ সালে গঠিত হয়। সেই সময় গোপীনাথ এখানে গ্রন্থাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হলেন। এই লাইব্রেরীকে রত্নভাণ্ডার বলা যায়। অজস্র গ্রন্থের এটি ভাণ্ডার তো বটেই,

তার উপর প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাজার হাতে-লেখা পুঁথি এখানে আছে। এই গ্রন্থেব অরণ্যের মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন গোপীনাথ। এবং এই গ্রন্থ ও পুঁথিপুঞ্জের মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে তিনি নিজের পথ কেটে ক্রমশঃ এগিয়ে চলতে লাগলেন। তাঁর জীবনের প্রকৃত ছাত্রজীবন এই সরস্বতী-ভবনে। বললেন, "এখানে এসে পাঠের অনেক সুবিধা হয়ে গেল।"

বাইরে থেকে তাঁর ডাক আসে, কিন্তু সরস্বতী-ভবন তাঁকে আর কোথাও যেতে বাধা দেয়। এই বাধাই তাঁর জীবনে দেখা দিয়েছে সম্পদ রূপে। এইখানে বসে বসে গুণের ঐশ্বর্যে তিনি নিজেকে কুবেরতুল্য করে তুলতে লাগলেন।

কুইন্‌স কলেজের ইংরেজি ও সংস্কৃত বিভাগের প্রিন্সিপাল-পদ থেকে ভেনিস অবসর গ্রহণ করার পর গোপীনাথ সংস্কৃত বিভাগ ও সংস্কৃত গ্রন্থাগারের প্রধানরূপে নিযুক্ত হলেন। ভেনিস রইলেন সংস্কৃত-স্টাডিজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হয়ে

এর পর ভেনিস হলেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। গোপীনাথও সেই সঙ্গে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালির রীডার হলেন। প্রায় তিন বছর তিনি এই কাজ করেছেন।

১৯১৮ সালে ভেনিস মারা গেলেন। কুইন্‌স কলেজের সংস্কৃত বিভাগের প্রিন্সিপাল হলেন তখন মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা।

গোপীনাথেব জ্ঞানেব সৌরভ তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সার্ আশুতোষ গোপীনাথকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের জন্যে আহ্বান করে পাঠালেন। কিন্তু কাশী ছেড়ে যেতে তাঁর মন চাইল না। সার্ আশুতোষের পরেও কলকাতা থেকে আবার ডাক এসেছে। লখনউ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও ডেকেছিলেন। বললেন, "কিন্তু কাশীর এই গ্রন্থাগার ত্যাগ করে আমি যেতে চাইলাম না।"

১৯২৩ সালে গঙ্গানাথ ঝা অবসর গ্রহণ করলেন। গোপীনাথ তখন সংস্কৃত বিভাগের প্রিন্সিপাল-পদে নিযুক্ত হলেন এবং সেই সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের সংস্কৃত স্টাডিজের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও সরকারী সংস্কৃত পরীক্ষাসমূহের রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হলেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ প্রিন্সিপালের পদে তিনি তেরো বছর একটানা কাজ করেছেন। কিন্তু তেরো বছরটা একটা সুদীর্ঘ সময় নয়। আরো দীর্ঘকাল তিনি এই পদে বহাল থাকতে পারতেন। কিন্তু মনের গতি তখন তাঁর বদলে গেছে। এতকাল বহু লোক নিয়ে বহু লোকের মধ্যে বসে তিনি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করে গিয়েছেন। এবার তাঁর জীবনে প্রয়োজন হল নিভৃতির। একাকী বসে নিবিড়ভাবে সাধনা করার অভিপ্রায় হল তাঁর। তিনি তাই এই পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিলেন ১৯৩৭ সালে। বললেন, "তদবধি সাধনাতেই বিভোর আছি।"

১৯৩৪ সনে ভারত সরকার তাঁকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন, ১৯৪৭ সনে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট. উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন।

১৯১০ সালে যখন প্রথম কাশীতে আসেন, তখন ইংরেজি সাহিত্যই তাঁকে মুগ্ধ করে রেখেছে এবং সেই সঙ্গে ইংরেজ কবিকুল। এই সময় তিনি প্রবাসীতে দুটো প্রবন্ধ লেখেন ব্রাউনিং সম্বন্ধে। আর-একটি বায়রন সম্বন্ধে—ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রতিভা পত্রিকায়। এ ছাড়া বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে সমালোচনামূলক প্রবন্ধও তিনি লিখেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কন্যা সরযূবালা দাশগুপ্তার ত্রিবেণীসঙ্গম সম্বন্ধে আলোচনা করেন প্রবাস-জ্যোতিতে। বর্তমানে কাশী থেকে উত্তরা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উত্তরার প্রতিষ্ঠার আগে কাশী থেকে প্রকাশিত হত প্রবাসজ্যোতি। এই প্রবাস-জ্যোতিতেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সাগরসঙ্গীত সম্বন্ধেও গোপীনাথ আলোচনা-

প্রবন্ধ লিখেছেন। তারপর লিখেছেন রবীন্দ্রনাথের বলাকা সম্বন্ধে অলকায়। ত্রৈমাসিক পত্রিকা বঙ্গসাহিত্যে রস ও সৌন্দর্য শিরোনামায় রসতত্ত্ব ও সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে লিখেছেন। আর লিখেছেন কুণ্ডলিনীতত্ত্ব নিয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ ; এই রচনা বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এর পর লেখেন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ—কাশ্মীর-শৈবাগমমূলক প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের বিস্তারিত আলোচনা। এই প্রবন্ধ বের হয় অলকায়। আর উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে—গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা ; এই রচনায় রামানুজ নিম্বার্ক মধ্ব বল্লভ ও প্রাচীন পাঞ্চরাত্র মতের বিস্তারিত আলোচনা আছে এবং অপরটি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা। এই দুইটি রচনাই উত্তরাতে প্রকাশিত হয়।

উত্তরাতে আরও যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাদেব মধ্যে কয়েকটির নাম— ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসেব সমালোচনা, প্রহ্লাদপুর শিলালেখ সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন, ভর্তৃহরি ও ইচিং, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বুদ্ধের উপদেশ, পূর্ণত্বের অভিযান, দত্তাত্রেয় সম্প্রদায়ের দার্শনিক মত, ভারতীয় সংস্কৃতি, ঈশ্বরপ্রাপ্তি ও তাহার সাধনজীবনের উদ্দেশ্য, তান্ত্রিক সাধনা সম্বন্ধে গুরুতত্ত্ব ও সদ্‌গুরুরহস্য, শক্তিপাতরহস্য, তান্ত্রিক সাধনার গোড়ার কথা, নাদবিন্দু কলা, পূজার পরম আদর্শ, ভাগবতে ঈশ্বর ও জীবতত্ত্ব ইত্যাদি।

বেনারস থেকে প্রকাশিত পন্থা নামক পত্রিকায় বের হয়েছে— শক্তি-সাধনা, লিঙ্গরহস্য, অবতার-বিজ্ঞান, যোগ ও যোগবিভূতি প্রভৃতি প্রবন্ধ।

ভারতবর্ষ পত্রিকায় মৃত্যুবিজ্ঞান ও পরমপদ কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

উদ্বোধনে প্রকাশিত হয় অনাদি সুষুপ্তি ও তাহার ভঙ্গ।

বিশ্ববাণীতে প্রকাশিত হয় মন্ত্র ও দেবতাতত্ত্ব।

উৎসবে প্রকাশিত হয় বাসনা-নিবৃত্তি ও ধর্মের সনাতন আদর্শ।

দেবযানে প্রকাশিত হয় রামনামের মহিমা।

সুদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ধারাবাহিকভাবে দীক্ষারহস্য।

সংস্কৃত রত্নাকর, অমরভারতী প্রভৃতিতে তাঁর সংস্কৃত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে বেদানাং বাস্তবিকং স্বরূপম্, বৈন্দবো দেহঃ, 'অস্পর্শ' যোগঃ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধচরিত্র সম্বন্ধে একটি সংস্কৃত নিবন্ধও তিনি লিখেছেন।

কাশী বিদ্যাপীঠ রজত-জয়ন্তী সংখ্যায় ইংরেজি প্রবন্ধ লিখেছেন— Kaivalya and its place in Dualstic Tantric Culture। পুনার Annals of the Bhandarkar Research Institute-এ লিখেছেন প্রতিভা সম্বন্ধে, যার ইংরেজি প্রতিশব্দ, তিনি বললেন, genius নয়, intuition। এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত গঙ্গানাথ ঝা রিসার্চ ইন্‌স্‌টিটিউট জার্নালে, ও মডার্ন রিভিউতেও তাঁর চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

১৯১৫ সালে উত্তরপ্রদেশ (ইউ. পি.) হিস্টরিকাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর জার্নালে তিনি অনেক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখেছেন।

এ ছাড়া হিন্দিতে রচনাও তাঁর আছে। গোরক্ষপুর গীতা প্রেস থেকে প্রকাশিত হিন্দি মাসিক পত্র কল্যাণে বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটা প্রবন্ধ লিখেছেন। এসব প্রবন্ধ এখন পত্রিকার পাতাতেই বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে আছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম—ঈশ্বরমেঁ বিশ্বাস, যোগকা বিষয়-পরিচয়, সূর্যবিজ্ঞান, ইষ্টরহস্য, ভক্তিরহস্য, কাশীমে মৃত্যু ঔর মুক্তি, পরকায়া-প্রবেশ, দীক্ষারহস্য, ভগবদ্ বিগ্রহ। কল্যাণ ব্যতীত অচ্যুত; মানবধর্ম (দিল্লি থেকে প্রকাশিত), রাষ্ট্রধর্ম (লখনউ থেকে প্রকাশিত), গীতাধর্ম, বিদ্যাপীঠ, মানব প্রভৃতি হিন্দি পত্রিকাতেও বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্যাপীঠ পত্রিকায় মধুসূদন সরস্বতী ও সংস্কৃত সাহিত্যকা ইতিহাসমেঁ কাশীকা ভাগ উল্লেখযোগ্য

ডক্টর ভেনিসের সময়েই তিনি নিজেদের একটি জার্নাল প্রকাশ করার প্রস্তাব করেন। তাঁর পরামর্শ অনুসারে প্রিন্সেস অব ওয়েলস সরস্বতী-ভবন টেকসটস্ ও প্রিন্সেস অব ওয়েলস্ সরস্বতী-ভবন স্টাডিজ নাম দিয়ে দুটি জার্নাল বের হয়। টেকসটস্-এ প্রায় বাহাত্তরখানা পুঁথি প্রকাশিত হয়। তার সাধারণ সম্পাদক গোপীনাথ। তা ছাড়া নিজেও তিনি কয়েকখানা গ্রন্থ সম্পাদন করেছেন। স্টাডিজে ইংরেজিতে তিনি অনেকগুলি মৌলিক প্রবন্ধ লেখেন—যথা, ন্যায়-বৈশেষিক সাহিত্য ও দর্শন, গোরক্ষনাথ, নয়া ভক্তিসূত্র, নির্মাণকায় (বৌদ্ধ দর্শন), শৈব দর্শন, বৈশেষিক সূত্র, নাথপন্থ, সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির বিবরণ, বেদের রহস্যবাদ ইত্যাদি। স্টাডিজে প্রকাশিত তাঁর মৌলিক প্রবন্ধগুলির নাম—

(1) The view-point of Nyaya-Vaisesika Philosophy, (2) Nirmana Kaya, (3) The system of Chakras according to Gorakshanatha, (4) A new Bhakti sutra, (5) Gileanings from the history and bibliography of Nyaya-Vaisesika literature, (6) Mimansa Mss in Government Sanskrit Library: Banaras, (7) Theism in Ancient India, (8) Parasurama Misra *alias* Vani Rasala Raya, (9) Date of Madhusudan Saraswati, (10) Some Variants in the readings of the Vaisesika Sutras, (11) Gleanings from the Tantras, (12) Satkaryyavada : the problem of causality in Sankhya, (13) The philosophy of Tripura Tantra, (14) Some aspects of Vira Saiva Philosophy, (15) Some aspects of the history and doctrines of the Nathas, (16) Notes on Pasupata Philosophy, (17) Mysticism in Veda, (18) Conception of

physical and super-physical organism in Sanskrit Literature, ইত্যাদি।

ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলে হিন্দুস্থান রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক বইটি মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝাকে সমালোচনার জন্যে দেন। গঙ্গানাথ ঝার অনুরোধে বইটির বিস্তারিত সমালোচনা করেন গোপীনাথ। গঙ্গানাথ ঝার ভূমিকা সহ ১৯২৩ সালে সমালোচনাটি হিন্দুস্থান রিভিউতে প্রকাশিত হয়। বললেন, "ভারত সরকার *Philosophy—East and West* নামে যে বিরাট গ্রন্থের আয়োজন করেছেন তাতে আমি শাক্তদর্শন বিষয়ে অধ্যায়টি লিখেছি। গ্রন্থ সম্পাদক ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের অনুরোধই ছিল এই রচনার প্রবর্তক।"

১৯১৮ সালে ইনি স্বামী বিশুদ্ধানন্দের কাছে যোগ-দীক্ষা গ্রহণ করেন। "তখন থেকেই মন সাধন-পথে চলে যায়, ১৯৩৭ সালে অবসর নিয়ে সাধনায় পুরোপুরি মগ্ন আছি।"

কেবল অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন নয়, সাধনা ও রচনাতেও তিনি তাঁর জীবন ডুবিয়ে রেখেছিলেন। সেই কারণেই তাঁর হাত দিয়ে এত বিভিন্ন রকমের রচনা বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে আরো অনেক কিছু লাভ করার আশা সম্ভবতঃ ছিল—তাঁর জ্ঞানের সঞ্চয় থেকে অনেক মূল্যবান সম্পদ, কিন্তু তিনি তাঁর জীবনের ধারা বদলে নিয়েছেন। অথ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নয়, তিনি যেন অথ আত্মজিজ্ঞাসা—এই প্রশ্নে নিজেকে বিব্রত রেখেছেন; আত্মবিশ্লেষণের মাঝখান দিয়েই তো ব্রহ্ম লাভ করা যায়। তিনি সেই পরমতম জ্ঞানের অনুসন্ধান করে চলেছেন এখন।

তাঁর জ্ঞানের সঞ্চয় থেকে যেমন আরও অনেক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে গেছে, তেমনি তাঁর জীবনের কাহিনীও আরও অনেক জানার ছিল, যেন তাও অপূর্ণ রয়ে গেল।

বাইরে অন্ধকার নেমেছে। দোতলার জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি কাশীর আকাশপট থেকে মুছে গেছে বড় বড় বাড়ির গম্বুজ ও মিনার এবং জলকলের বড় চোঙটা। সন্ধ্যে গড়িয়ে গেল। গোপীনাথ তাঁর জীবনালেখ্য এঁকে গেলেন তাঁর কথার তুলি দিয়ে। সেই ছবির ছাপ মনের মধ্যে পুঁজি করে বেরিয়ে এলাম। তবু মনে হল, আরও বুঝি জানার ছিল। কিন্তু আর জানা হবে না—কাল ওঁর মৌন দিবস।

রিকশায় উঠে বসলাম। সোজা গোধুলিয়া অভিমুখে। সুরেশ চক্রবর্তী মহাশয় বললেন, "কাশীতে এলেন তীর্থ করে যান।" বললাম, "তীর্থ মানে? তীর্থ করা কি হল না?" সুরেশবাবু একটু চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলেন, বললেন, "তা বটে।"

রচিত গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ-প্রসঙ্গ। ৫ খণ্ড

অখণ্ড মহাযোগ

সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

কিরণাবলী ভাস্কর (বৈশেষিক)—পদ্মনাভ-কৃত

কুসুমাঞ্জলি-বোধিনী (ন্যায়)—উদয়ন-কৃত

রসসার (বৈশেষিক)—বাদীন্দ্র-কৃত

যোগিনীহৃদয়দীপিকা (শাক্ত আগম)। ২ খণ্ড—অমৃতানন্দ-কৃত

ত্রিপুরারহস্য—জ্ঞানখণ্ড (শাক্ত আগম দর্শন) ৪খণ্ড—হারিতায়ন-কৃত

ভক্তিচন্দ্রিকা (ভক্তিশাস্ত্র)।—নারায়ণতীর্থ-কৃত

সিদ্ধান্তরত্ন (গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন)।—বলদেব-কৃত

সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ

A Descriptive Catalogue of Mimansa Mss in Govt.
Sanskrit Library, Banaras.

Annual Catalogue of Mss acquired for
Sarasvati Bhavana, Banaras.

অন্যের লিখিত গ্রন্থের ভূমিকা

গঙ্গানাথ ঝা কৃত বাৎস্যায়ন ভাষ্যের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকা

গঙ্গানাথ ঝা কৃত তন্ত্রবার্তিকের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকা

দুর্গাচৈতন্য ভারতী কৃত দেবীযুদ্ধে চিন্তনীয় গ্রন্থের ভূমিকা

তারামোহন বেদান্তরত্ন কৃত অগস্ত্য চরিত নামক গ্রন্থের ভূমিকা

পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য কৃত ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষা নামক গ্রন্থের ভূমিকা

বলদেব উপাধ্যায় কৃত বৌদ্ধদর্শন নামক গ্রন্থের ভূমিকা

শ্রীমদ্‌ভাস্করানন্দজীর গুরুদেব রচিত উপেন্দ্রবিজ্ঞান সূত্রের ভূমিকা

মেহের পীঠের সর্ববিদ্যাচার্য সর্বানন্দ রচিত সর্বোল্লাসতন্ত্রের প্রাক্‌কথন

হারাণচন্দ্র শাস্ত্রি-রচিত কালসিদ্ধান্তদর্শিনী নামক গ্রন্থের ভূমিকা

উমেশমিশ্র রচিত *Conception of Matter* নামক গ্রন্থের ভূমিকা

গুরুপ্রিয়াদেবী রচিত শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী নামক গ্রন্থের ভূমিকা

গুরুপ্রিয়াদেবী রচিত অখণ্ডমহাযজ্ঞের ভূমিকা

রাজবালাদেবী রচিত শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতা প্রবন্ধ নামক গ্রন্থের ভূমিকা

নাথমল টাঁটিয়া রচিত *Studies in Jain Philosophy* গ্রন্থের ভূমিকা

হরদত্ত শর্মা সম্পাদিত শ্রীশঙ্করাচার্য কৃত সাংখ্যকারিকার জয়মঙ্গলা-টীকার ভূমিকা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বাগচী

খাড়া সিঁড়ি উঠে গেছে প্রায় রাস্তার কিনার থেকে একেবারে তেতলা অবধি। মাঝে দু-তিনটি বাঁক। সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে অনেকটা উপরে উঠে এলাম, বাঁক নিয়ে আরও উপরে উঠলাম, তার পর তৃতীয় বাঁক নিয়ে আরও কয়েকটা সিঁড়ি ভাঙার পর পেলাম একটা উন্মুক্ত দরজা।

দরজার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, মেঝেয় মাদুর বিছানো— তারই একপাশে বসে আছেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বাগচী তর্কতীর্থ মহাশয়। ঘরের একপাশে স্তূপ করা কতকগুলো বই আর পুঁথি, তার কাছেই দেয়ালে একটা বড় ছবি টাঙানো। ঘরের আলো খুব উজ্জ্বল ছিল না, মনে হল ছবিটা বুঝি তাঁর নিজেরই।

বললেন, "ও ছবি আমার পিতার। আমার পিতার নাম স্বর্গীয় জগৎচন্দ্র বাগচী।"

সন্ধ্যে গড়িয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে। তাঁর বাড়ির নম্বরটা জানা ছিল না। তাই আমহার্স্ট স্ট্রীট আর পটলডাঙার মোড়ে এসে ফুটপাথের ধারের একটা রঙের দোকানে তাঁর নাম বলতেই দোকানী চিনিয়ে দিলেন বাড়িটা।

১১ই নবেম্বর ১৯৫২, ২৫শে কার্তিক ১৩৫৯ মঙ্গলবার। তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়েছি। আগে কোনো খবর দেওয়া ছিল না, তাই আমার আগমনের উদ্দেশ্যে তাঁকে বললাম।

বললাম, জানতে এসেছি তাঁর জীবনের কাহিনী। কিভাবে তিনি গড়ে তুলেছেন নিজেকে, কিভাবে প্রেরণা লাভ করেছেন, বাধাবিপত্তি ডিঙিয়ে এগিয়ে চলেছেন কিভাবে। জ্ঞানান্বেষণের জন্যে ছোটখাট অভিযান

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ

তাঁকে করতেই হয়েছে, সেই অভিযানের গল্প শুনতে এসেছি। —এতে লাভ ? লাভ আছে। দুরূহকে আয়ত্ত করতে হলে কঠোর শ্রম ও দীর্ঘ তপস্যা যে আবশ্যক, তা সকলে জেনে প্রেরণা লাভ যদি করে, তাহলে সেটা লাভ ছাড়া কী ?

ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট তিনি অধ্যয়ন করেছেন। আজ শাস্ত্রী মহাশয় স্বর্গত। তাঁর কথা তাঁর মনে পড়ে গেছে। আবেগ-রুদ্ধ গলায় তিনি বলতে লাগলেন তাঁর কথা, কেবল লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহাশয়ের পাণ্ডিত্যেই তিনি মুগ্ধ নন—তাঁর হৃদয়ের পরিচয়েও তিনি যে অভিভূত তা স্পষ্ট বোঝা গেল। সম্ভবত এই রকমই ছিল সেকালের গুরুশিষ্যের সম্পর্ক। হৃদয়ে হৃদয়ে এই রকমই ছিল নিবিড় বন্ধন।

১২৯৪ বঙ্গাব্দ [খ্রীস্টীয় ১৮৮৭] সালে জন্মগ্রহণ করেছেন তিনি। "ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার সুসঙ্গ-দুর্গাপুরে আমার জন্ম। এই স্থান গারো পাহাড়ের অতি নিকটে। গ্রাম থেকে পাহাড়ের সমুদয় দৃশ্য দেখা যায়। এই পাহাড় থেকে সোমেশ্বরী নদী প্রবাহিত হয়ে আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে গিয়েছে।"

সুসঙ্গের রাজারা সুদীর্ঘ কালের রাজা। এই গ্রাম একটি বন্দর। এখান থেকে নদীপথে বছরে প্রায় দুই লক্ষ মণ চাল বাইরে চালান হত। এটা বর্ধিষ্ণু গ্রাম।

বললেন, "আমার পিতার আদি নিবাস পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের অন্তর্গত—জামিরতা গ্রামে। সেখান থেকে এসে আমার পিতা সুসঙ্গ-দুর্গাপুরে বাস স্থাপন করেন। তিনি সুসঙ্গ-রাজ সরকারে চাকরি করতেন। তিনি অতি নিষ্ঠাবান পুরুষ ছিলেন।"

তিনি নিজে সংস্কৃতজ্ঞ সুপণ্ডিত, কিন্তু তাঁদের বংশে কেউ সংস্কৃত-চর্চা করেছেন বলে তাঁর জানা নেই। কিন্তু তাঁর মাতামহ ভুবনেশ্বর

বিশারদ সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। এঁর নিবাস পাবনার সিরাজগঞ্জের ভাঙাবাড়িতে। তাঁর টোল ছিল। টোলে ছাত্র ছিল অসংখ্য। এঁরা বংশানুক্রমে পণ্ডিত—পণ্ডিতের ধারা।

বললেন, "আমার বাল্যকালেই সংস্কৃতের প্রতি আকর্ষণ বোধ করি এবং এই শাস্ত্রের প্রতি রুচি জন্মে। কেন জানি নে, মনে হয়, মাতামহ থেকেই এই প্রবণতা এসেছে।"

বাল্যকালে সুসঙ্গ মাইনর স্কুলে পাঠ সমাপ্ত করে তিনি সংস্কৃত পড়তে আরম্ভ করেন। মাইনর পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে গ্রাম থেকে ময়মনসিংহ শহরে যেতে হয়। পরীক্ষা দিতে এখানে এসে তিনি ক্রয় করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত উপক্রমণিকা। ময়মনসিংহ থেকে সুসঙ্গ যেতে হত নৌকা-পথে—ছয় দিনের পথ। এই ছয় দিনে নৌকায় বসে তিনি উপক্রমণিকা আদ্যোপান্ত-পাঠ শেষ করেন।

এর পর থেকেই সংস্কৃতের প্রতি তাঁর আগ্রহ প্রকাশ পায়। তিনি তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

কিন্তু তাঁর বংশের কেউই যখন সংস্কৃত চর্চা করেন নি, তখন তাঁর এই আগ্রহটা সকলের কাছে অস্বাভাবিক বলে ঠেকে থাকবে। তাই আত্মীয়স্বজনেরা রীতিমত বিরোধিতা আরম্ভ করলেন। হয়তো তাঁকে পরাভব স্বীকার করতে হত এবং জীবনে সংস্কৃত চর্চা করা সম্ভব হত না, যদি অন্তত একজনও তাঁর সহায় না হতেন।

বললেন, "আমার এই সঙ্কল্পে উৎসাহ পেলাম যাঁর কাছ থেকে—তিনি আমার পিতা।"

তাছাড়া, নাম বললেন আর এক জনের—তিনি সুসঙ্গের মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ। ইনিও তাঁকে উৎসাহ দান করেন। কেবল মৌখিক উৎসাহ নয়, প্রয়োজনীয় অনেক পুস্তকও তিনি দেন।

"সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধে আমার কোনোই ধারণা ছিল না, আরও অসুবিধা এই ছিল যে, আমাদের নিকটবর্তী কেউই এ বিষয়ে রুচিসম্পন্ন ছিলেন না। এ জন্যে প্রথমজীবনে সংস্কৃত শিক্ষায় বিশেষ সহায়তা পাই নি। সুসঙ্গের মহারাজার সভাপণ্ডিত কৃপানাথ তর্করত্ন মহাশয়ের কাছে আমি প্রথম কলাপ-ব্যাকরণ পড়তে আরম্ভ করি।"

বাড়িতে থেকে পাঠে বিঘ্ন ঘটবে মনে হওয়ায় তিনি সিরাজগঞ্জে মাতুলালয়ে চলে যান। তাঁর মামা তারকেশ্বর চক্রবর্তী কবিশিরোমণি অতি প্রসিদ্ধ কবিরাজ ছিলেন এবং নানা শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্যও ছিল অগাধ। বললেন, "আমি তাঁর কাছে কলাপ-ব্যাকরণ পড়তে থাকি। নানা কাজে তিনি ব্যস্ত থাকায় তাঁর কাছে পাঠ উত্তমরূপে হতে পারে না বিবেচনা করে তিনিই আমাকে তাঁর খুড়ামহাশয়ের কাছে ভাঙা-বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। ইনি রাজনাথ তর্কতীর্থ। এখানে তাঁর টোল ছিল। ইনি অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। অতিশয় স্নেহ ও আগ্রহের সঙ্গে ইনি আমাকে কলাপ-ব্যাকরণ পড়ান। আমার ধারণা সংস্কৃত সাহিত্যে আমার যদি কিছু ব্যুৎপত্তি থেকে থাকে তাহলে তা তাঁরই কৃপায়।"

এর পর তিনি উল্লেখ করলেন তাঁর এক সতীর্থের কথা। ইনি কলকাতা বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের অধ্যক্ষ ধরণীধর গুপ্ত। তাঁর বহুদিনের সঙ্গী ছিলেন ইনি। বন্ধু-বিয়োগের বেদনা আজও তিনি ভুলতে পারেন নি, সতীর্থদের প্রতি প্রীতির কথা তাঁর মনে পড়ে থাকবে, কণ্ঠস্বর বাষ্পাকুল হয়ে এল, বললেন, "ধরণী আমার বয়ঃকনিষ্ঠ, সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনাতে সে ছিল আমার চিরসঙ্গী। অল্পদিন হল তার স্বর্গবাস হয়েছে। তাকে হারিয়ে মন ভেঙে গেছে। একলা আছি, আর কেউ নেই।"

কিছুক্ষণ থেমে পুনরায় ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন তাঁর জীবনের কথা।—

ব্যাকরণের পাঠ শেষ করে ভাঙাবাড়ি থেকে সিরাজগঞ্জে তিনি ফিরে আসেন। এই সময় তাঁর বয়স আঠারো বৎসর। তাঁর মাতুল তারকেশ্বর কবিরাজ মহাশয় উদ্যোগ করে তাঁকে টাঙাইলের অন্তর্গত হালালিয়া গ্রামে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করবার জন্যে পাঠিয়ে দেন। এখানে এসে তিনি গোপালনাথ তর্কতীর্থের কাছে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। কিছুদিন পর গোপালনাথ বগুড়ার শেরপুরে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়ে সেখানে যান। "সেইসঙ্গে আমিও বগুড়ায় গিয়ে তাঁর কাছে অধ্যয়নে রত থাকি। মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ মহাশয় সেই সময় ছিলেন মুর্শিদাবাদ জুবিলি-টোলের অধ্যাপক। বগুড়া থেকে মুর্শিদাবাদে গিয়ে আমি এঁর কাছে দীর্ঘকাল অধ্যয়ন করে তর্কতীর্থ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই।"

তর্কতীর্থ পরীক্ষা পাশ করার পর তিনি যান রাজসাহীতে। সেখানে হেমন্তকুমারী কলেজে মহামহোপাধ্যায় গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ মহাশয়ের কাছে পক্ষতা প্রভৃতি নব্যন্যায়ের গ্রন্থ অধ্যয়ন করে পুনরায় ফিরে যান মুর্শিদাবাদে এবং চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থের কাছে পূর্ববৎ অধ্যয়নে রত হন। এখানকার পাঠ সমাপ্ত করে তিনি চলে আসেন কলকাতায়।

বললেন, "এখানে এসে সংস্কৃত কলেজে মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় মহাশয়ের নিকটে ও পূর্ব-অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ মহাশয়ের নিকটে সাংখ্য ও বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করি।"

এর আগেই তিনি মীমাংসা-দর্শন ও অলংকার-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদ জুবিলি-টোলের ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক দুর্গাসুন্দর স্মৃতিরত্ন এই বিষয়ে তাঁর গুরু। এঁরই কাছে তিনি উক্ত শাস্ত্রদ্বয় পাঠ করেন। বললেন, "ইনি ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক হলেও সমস্ত শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। আমি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি

যে, আমি যে মীমাংসা ও অলংকার শাস্ত্র পড়তাম তা তিনি মুখে মুখেই পড়াতেন, কোনো গ্রন্থ দেখার তাঁর আবশ্যক হত না। এইসব দুরূহ গ্রন্থরাশি তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। আমার পুস্তকের অশুদ্ধ পাঠও তিনি সংশোধন করে দিতেন। এঁর নিবাস ময়মনসিংহের শেরপুরে।"

কলকাতায় এসে ১০ নম্বর পটলডাঙ্গা নিবাসী কবিরাজ শরৎচন্দ্র সাংখ্যতীর্থের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মে। এই সময় আরও দু'জনের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন—তাঁরা হচ্ছেন বিনয়কুমার সরকার ও শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়। বিনয়কুমার সরকার তখন মুসলমানপাড়া লেনে থাকতেন, তাঁর গৃহে তিনি কিছুদিন বাস করেন।

বললেন, "আমার পরমসুহৃদ ও আমার গুরু সদৃশ শ্রীযুত কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের সঙ্গে এই সময় আমার দেখা হয়। আমি হালালিয়াতে যখন অধ্যয়ন করি তখনই কাঁঠালিয়া নিবাসী কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তাঁর লোকাতিশায়ী গুণরাশিতে আমি অতিশয় আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হই। কলকাতায় এসেও তাঁর সঙ্গলাভ হওয়ায় আমার বিশেষ উপকার হয়। এক কথায় তিনিই আমার জীবনের সমস্ত কল্যাণের মূল। দুরূহ অধ্যাত্ম শাস্ত্রসমূহের রহস্য তিনিই আমাকে শিষ্যের মত পড়িয়ে ও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সেইসমস্ত উপদেশ এখনো আমার হৃদয়ে জাগরূক আছে।"

সাংখ্যতীর্থ মহাশয় এই সময় ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। কারণবশতঃ তাঁকে এই পদ থেকে অবসর গ্রহণ করতে হয়। "তাঁর স্থানে আমাকে তিনি ন্যাশনাল কলেজে কাজ গ্রহণ করিয়েছিলেন।"

এইভাবে কলকাতায় অধ্যয়ন করতে করতে তিনি পণ্ডিত লক্ষ্মণ শাস্ত্রীর কাছে বেদান্তের ও সাংখ্যের উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহাশয় যখন কাশী থেকে কলকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হয়ে কলকাতায় আসেন তখনই তাঁর কাছে ইনি পাঠ আরম্ভ করেন। "এই সময় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী প্রভৃতি লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে অধ্যয়ন করেন। এঁরা সকলেই আমার সতীর্থ।"

বেদান্ততীর্থ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি স্থকিয়া স্ট্রীটে বিনয়-কুমার সরকার ও শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁদের বাসায় অবস্থান করেন এবং তাঁদের সঙ্গেই কিছুদিন পুরীতে ও পরে রাঁচীতে বাস করেন। রাঁচী থাকাকালে তাঁর ডাক আসে হরিদ্বার থেকে।

বললেল, "হরিদ্বার গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একখানি পত্র পাই। সেই পত্রে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকের কথা বলা হয়। চিঠি পেয়ে আমি গুরুকুল যেতে সম্মত হই। এ ঘটনা ১৯১৪ সালের দুর্গাপূজার কিছু আগের ঘটনা।"

সন-তারিখ তাঁর ঠিক মনে নেই, বললেন, "১৯১৪ই হবে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন সবে বেধেছে।"

কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থের সম্বন্ধে তিনি আগেই বলেছেন, তিনিই তাঁর জীবনের সকল কল্যাণের মূল বলে তাঁর উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনও করেছেন। হরিদ্বার থেকে তাঁর যে আহ্বান এল এর মূলেও আছেন কেদারনাথ। কেদারনাথের ভাগিনেয় তখন গুরুকুলে গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। বললেন, "তাঁর পরিচয়েই আমি গুরুকুল যাই। সাত বৎসর নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করি।"

হরিদ্বার গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন তখন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। এঁর নিবাস পাঞ্জাবের জলন্ধরে। প্রথমে এঁর নাম ছিল লালা মুনশিরাম।

কিছুদিন পরে লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহাশয় কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পদ পরিত্যাগ করেন। তখন ওই শূন্য পদের জন্যে ইনি প্রার্থী হন তখন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন সংস্কৃত কলেজের গবর্নিং বডির অধ্যক্ষ। লক্ষণ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্থানে নিযুক্ত হলেন তাঁরই শিষ্য যোগেন্দ্রনাথ।

এইভাবে তাঁর জীবনে উন্নতি ঘটতে লাগল। তিনি যে জ্ঞান অর্জন করেছেন, তার স্বীকৃতি লাভ ঘটতে লাগল।

তিনি যখন সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগ দেন তখন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ শাস্ত্রী এর পরে অধ্যক্ষ হন শ্রীযুক্ত আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং তার পরে সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত।

"শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথের সময়ই আমি মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত হই। এই সময় আমি অদ্বৈতসিদ্ধির টীকা ও বঙ্গানুবাদ রচনা করি। ন্যায়ামৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদও আমার এই সময়ের রচনা। স্বর্গত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ আমার অতিশয় অনুরক্ত হন, অতিশয় পরিশ্রম স্বীকার করে অতি উৎসাহের সঙ্গে তিনি প্রতিদিন এই গ্রন্থগুলি লিখে নেন এবং নিজ ব্যয়েই তা মুদ্রিত করেন। দুই খণ্ড অদ্বৈতসিদ্ধি মুদ্রিত হওয়ার পর তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে তিনি স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দরূপে পরিচিত হন।"

১৯২১ সালে কলকাতা সংস্কৃত কলেজে ইনি বেদান্তের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি স্বর্গত মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে অতিশয় ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হন। বললেন, "আমার প্রতি তাঁর পুত্রাধিক স্নেহ আমার হৃদয়ে চিরজাগরূক রয়েছে।"

১৬২নং বহুবাজার স্ট্রীটে মজুমদার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত উৎসব সৎসঙ্গ কার্যালয়ে প্রত্যেক শনিবারে ধর্মের আলোচনার জন্যে একটি অধিবেশন হত। এই অধিবেশনে কলকাতা ও কলকাতার নিকটবর্তী স্থানের বহু

বিদ্বান গুণী জ্ঞানী জনগণের সমাগত হত। "আমি এই প্রতিষ্ঠানে বিশ বৎসর নিয়মিতভাবে ধর্মোপদেশকের কার্য করেছি। এই সভায় আমার সঙ্গে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় হয়। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য ৬।১, উইলিয়মস্ লেন নিবাসী স্বর্গত মহাপ্রাণ ক্ষিতিন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়। তিনি আমার অকৃত্রিম বান্ধব, সংরক্ষক ও পরিচালক ছিলেন। তাঁর সর্ববিধ সহায়তা না পেলে আমি কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারতাম না। তাঁর অমায়িক মধুর ব্যবহার ভাষায় প্রকাশ্য নয়। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট কল্যাণীয় শ্রীমান বিনায়কনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এখনও পর্যন্ত আমার পূর্ববৎ ব্যবহার আছে। মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসর স্বর্গত ডাক্তার *টি* সুর মহাশয়ের সঙ্গেও আমার উৎসব সংসঙ্গেই পরিচয় হয়। এর যোগ্য পুত্রগণ পিতার সম্বন্ধ রক্ষা করেন।"

উৎসব সংসঙ্গে আরও বহু কৃতিব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয়। কিন্তু সকলের নাম তিনি বাহুল্য ভয়ে আর উল্লেখ করলেন না। এঁরা সকলেই তাঁর জীবনে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছেন। এইজন্য তিনি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। সেই কৃতজ্ঞতা তিনি অকপট ও অকুণ্ঠ ভাবে প্রকাশ করে যেন পরিতৃপ্তি লাভ করলেন।

তাঁর অধ্যাপনা-জীবনে তাঁর সংসর্গে এসেছেন অনেক ছাত্র। উত্তর-জীবনে তাঁদের মধ্যে অনেকেই কৃতিপুরুষ হয়ে উঠেছেন। এঁদের কৃতিত্বের জন্য তিনি যেন নিজে গৌরব বোধ করেন। তিনি নাম বললেন তাঁদের— পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীধীরেন্দ্রমোহন দত্ত, চুঁচুড়া নন্দলাল চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীকামাখ্যানাথ স্মৃতিবেদান্ততীর্থ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ, আসাম নলবাড়ি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন স্মৃতিমীমাংসাতীর্থ,

বাঙলা সরকারের টোল-বিভাগের ইন্সপেক্টর শ্রীমান পঞ্চানন শাস্ত্রী তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীভূতনাথ সপ্ততীর্থ, মেদিনীপুর কাঁথি সংস্কৃত কলেজের বেদান্ত অধ্যাপক শ্রীমান শ্রীমোহন তর্কবেদান্ততীর্থ, হাওড়া নিম্বার্ক আশ্রমের অধ্যাপক শ্রীমান বিনোদবিহারী পঞ্চতীর্থ, প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য, হুগলী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম, কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর সদানন্দ ভাদুড়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়। বললেন, "এ ছাড়া কলকাতা গদাধর আশ্রমের অধ্যাপক শ্রীমান রামছবিলা শাস্ত্রী ও সুদামা শাস্ত্রী প্রভৃতি অবাঙালী ছাত্রেরাও আমার কাছে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।"

একটি উৎস থেকে উৎপত্তিলাভ করে যেমন শতধারায় ছড়িয়ে পড়ে জলধারা, এই জ্ঞানধারাও তেমনি ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন দিকে। বিভিন্ন দিকের ভূমি উর্বর করে চলেছে সেই ধারাবলী। তিনি তাঁর ছাত্রদের নাম উল্লেখ করে যেন সেই উর্বরক্ষেত্রসমূহের দিকে অঙ্গুলি-সংকেত করলেন।

১৯৪২ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক-পদ থেকে ইনি অবসর গ্রহণ করেছেন। অবসর গ্রহণের মাস দুই আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত করে তাঁকে একটি নিয়োগপত্র দেন। তদনুসারে ১৯৪৩ সালের ২রা জানুয়ারি তিনি ঐ কাজে যোগদান করেন। সেই পদে এতদিন বহাল ছিলেন। বললেন, "দেড় বছর পূর্বে পশ্চিম-বাংলা সরকার কর্তৃক কলকাতা সংস্কৃত কলেজে দর্শনশাস্ত্রে গবেষণা-কার্যের জন্য নিযুক্ত হয়েছি এবং বর্তমানে আমি এই কাজ করছি।"

মুর্শিদাবাদে যখন তিনি অধ্যয়ন-রত তখন পরম ভাগবত বৈষ্ণবকবি বিল্বমঙ্গল-বিরচিত বিল্বমঙ্গলম্ নামে একখানি খণ্ডকাব্য অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। এইটেই তাঁর জীবনের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ।

এর পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করার সময় তিনি আর্যদর্শনশাস্ত্র-সমূহের অবিরোধ দেখাবার জন্যে ও আর্যদার্শনিকগণের বিচার-রীতি প্রদর্শনের জন্যে দুইখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এ ছাড়াও তিনি আরও দুইখানি বই লিখেছেন।

তাঁর জীবনের কাহিনী শুনে এবার বিদায় নেওয়া গেল। দৃষ্টির নেপথ্যে থেকে যাঁরা জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানবিতরণ করে চলেছেন ইনি তাঁদের অন্যতম। বিনয়ে নম্র এবং অতি সরল স্বভাব এইসব কৃতী পুরুষদের সান্নিধ্যলাভ করতে হলে মাটি থেকে অনেক উপরেই উঠে আসতে হয়। সেই উপর থেকে এবার ধীরে ধীরে নেমে এলাম রাস্তায়— ফুটপাথে। এখানে শহরের কর্মকোলাহল ও কলরব। কিন্তু ঐ উপরে রেখে এলাম একটি শান্ত পরিবেশ। সমুদ্র যেখানে গভীর সেখানে নাকি তরঙ্গের উচ্ছ্বাস কম। জনসমুদ্রের এই উচ্ছলতার মাঝখানে পড়ে এই কথাই মনে হতে লাগল।

রচিত গ্রন্থাবলী

বিল্বমঙ্গলম্
প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি
জন্মানুসারে বর্ণব্যবস্থা

বসন্তরঞ্জন রায়

ঝাড়গ্রামে গিয়ে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করা সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে পত্রালাপ করি। তিনি অসুস্থ ছিলেন ব'লে তাঁরই পরামর্শে দিন-কয়েকের জন্যে দেখা করা স্থগিত রাখা হয়। ইতিমধ্যে তিনি আমাদের জন্যে তাঁর বংশ-পরিচয়ের কড়চা ও জীবনের ঘটনাবলী লিখে রাখেন। কিন্তু অসুস্থতা থেকে নিষ্কৃতি তিনি পেলেন না। কয়েক দিন পরে তাঁর পুত্র শ্রীরামপ্রসাদ রায় চিঠি লিখে জানালেন—

> ...আপনার পত্র পাইলাম। বাবাকে সুস্থ করিয়া তুলিতে পারিলাম না; তিনি গত ২৩শে কার্তিক ১৩৫৯ [৯ নবেম্বর ১৯৫২] রাত্রি সাড়ে ৯টার সময় সজ্ঞানে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।...

এই চিঠি পেয়ে স্থির করি, বসন্তরঞ্জন যে তথ্য লিখে রেখে গেছেন, তা ঝাড়গ্রাম থেকে এনে তার সাহায্যেই তাঁর জীবনকথা রচনা করব। এবং তাই করা হল।—তাঁর মৃত্যুসংবাদ ২৭শে কার্তিক ১৩৫৯ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

॥ বংশপরিচয়ের কড়চা ॥

মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে বসন্তরঞ্জন-লিখিত

ঘটকদের বর্ণনা অনুসারে বেলিয়াতোড়বাসী গুহ-রায় গোষ্ঠী যশোহর সমাজভুক্ত; এবং রাঢ়ে উপনিবিষ্ট আড়াই ঘর গুহ মধ্যে আধ ঘর। ইঁহারা যে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের ছয় পুত্রের অন্যতম রাজীবলোচন

মজুমদারের বংশধর, তাহার সমর্থন পাওয়া যায় সর্বসাময়িক পুথিপত্রে। দেশাবলিবিবৃতিতে বেলিয়াতোড়ের আধা-সংস্কৃত নাম বালিয়াতৌটিক। উহাতে আরও আছে, এখানে বহু কায়স্থ জাতির বাস। এবং রাজা গোপাল সিংহের মন্ত্রী রাজীব তথায় বাস করেন। ভগীরথ গুহের সহিত এই বংশের সাক্ষাৎসম্পর্কের একান্ত প্রমাণাভাব। আজও গুহগোষ্ঠী যশোহরের পুরাতন স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছেন। তাহার নিদর্শন দুর্গোৎসবে পূর্ণাবয়ব দেবী-প্রতিমার পরিবর্তে যশোহরেশ্বরীর আদর্শে মুখপাত্র অর্চনার ব্যবস্থা। অল্প কিছুদিন পূর্বেও গুহ গোষ্ঠীর ভিতর রাজা বসন্ত রায় ও প্রতাপাদিত্যঘটিত বহু গালগল্প সাগ্রহে আলোচিত হইত। সে যাহা হউক কনৌজাগত বিরাট গুহ হইতে ইহারা ২৩।২৪ পর্যায়ের। কয়েক পুরুষ ধরিয়া গুহবংশীয়েরা বিষ্ণুপুররাজের দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সতত্বরাম ও মুকুন্দরাম যথাক্রমে মহারাজা রঘুনাথ সিংহ ২য় (শকাব্দ ৬২৫।৩৪) এবং চৈতন্য সিংহের (শকাব্দ ১৬৭১-১৭২৪) সমকালে দেওয়ান ছিলেন। দেওয়ান বিদ্যাধর শৌখীন পুরুষ ছিলেন; মেজাজ ও চালচলন কতকটা আমিরী ধরনের ছিল। লালমোহনের কবিশেখর আখ্যা ছিল। ইনি শ্রীশ্রীগোপাল বিগ্রহের সম্মুখে নিত্য নূতন স্তোত্র (অবশ্য সংস্কৃতে) রচনা করিয়া আবৃত্তি করিতেন। দুঃখের বিষয়, সেগুলি অযত্নে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক সময় দেওয়ান বংশের খ্যাতি-প্রতিপত্তি যথেষ্টই ছিল। রাধাকান্ত মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং তদীয় অনুজ নবকিশোর তথায় ক্রোরীর কার্য করিতেন। বেণীমাধব সিপাহী-যুদ্ধের সময় পুরুলিয়ার ডেপুটি কমিশনারের সেরেস্তাদার ছিলেন। ইহার অন্নদাতা বলিয়া সুনাম ছিল। বেণীমাধবের মধ্যম সহোদর গোপালচরণ অত্যন্ত লোকপ্রিয় ছিলেন। মহাভারতের সুবক্তা, সুযশ ছিল। নীলকণ্ঠ পরিণত-বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন।

রামচরণ বাঁকুড়া বেঞ্চে দীর্ঘকাল অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। যুগলবিহারী গ্রাম্য বিবাদ-বিসংবাদ মিটাইতে সুদক্ষ ছিলেন। রায় বাহাদুর বামাচরণ বাঁকুড়া বারের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন এবং চরিত্রগুণে আপামর সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরের উদীয়মান ব্যবহারজীবী ছিলেন। অবিনাশচন্দ্র অ্যালবার্ট কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। বসন্তরঞ্জন এই বংশেরই একজন।

সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে শেষজীবন লখনউতে অতিবাহিত করছিলেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ও ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার দ্বারা তাঁর জীবনের কাহিনী অবগত হয়ে তাঁর জীবন-কথা রচনার অভিপ্রায় তাঁকে জানাই। তিনি এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে যেদিন (১৮ই ডিসেম্বর ১৯৫২) আমাকে চিঠি দেন, দুর্ভাগ্যবশত সেই দিনই অকস্মাৎ তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর চিঠি ও মৃত্যুসংবাদ প্রায় একই সময় আমাদের কাছে পৌছয়। তাঁর লিখিত চিঠি হুবহু এখানে তুলে দিলাম—

সুলতানের বাংলো, বাদশাবাগ
২২, ক্যামেরন রোড, লখনউ
১৮।১২।৫২

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার ১৭।১২।৫২ তারিখের লিখিত পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আমি আজ প্রায় ৭ বৎসর যাবৎ নানারোগে শয্যাগত হইয়া আছি এবং এই অবস্থাতেও আমার ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের ৫ম খণ্ড লিখিতেছি। এই অবস্থায় এখন আমার নিজের উদ্যোগে নিজের সম্বন্ধে কিছু লিখাইয়া

রাখা আমার পক্ষে রুচিকর নয় এবং ইহাতে আমি ক্লান্তিও বোধ করিব। তাহা ছাড়া আপনাদের কাগজে আমার সম্বন্ধে কতটুকু স্থান দিতে পারেন এবং আমার জীবনের কোন্ অংশগুলি আপনাদের কাগজের পক্ষে আদরণীয় হইবে তাহা আমার পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়। সেইজন্য আপনি যদি এখানে আসিয়া আমার সহিত গল্প-আলাপ করিয়া যান এবং তাহাই অবলম্বন করিয়া যাহাকিছু লিখিবার তাহা লেখেন এবং আমাকে তাহা শোনাইয়া যান, তাহা হইলেই ভালো হয় বলিয়া মনে হয়। আপনিও সেই প্রস্তাবই করিয়াছেন। আপনারা যে উদ্যোগ করিতেছেন, তাহার প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং আমি যতটুকু পারি সে বিষয়ে সাহায্য করিব। ভগবান্ আপনাদের মঙ্গল করুন। ইতি—

মঙ্গলার্থী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

পুনশ্চ—আমাদের বাসা একেবারে ইউনিভার্সিটির মধ্যে। ইউনিভার্সিটির অনেকগুলি গেট আছে। পোস্ট অফিসের সন্নিকটস্থ গেট দিয়া আসিলে অল্প দূরেই আমাদের বাড়ীতে আসা যায়। এখানে ট্যাক্সি বা ঘোড়ার গাড়ী নাই। সাইকেল-রিকশা বা টোঙ্গাই প্রধান যানবাহন। ইউনিভার্সিটি লখনউ-স্টেশন হইতে ৪ মাইল।

এইটেই সম্ভবত তাঁর জীবনের শেষ রচনা। এই পত্র রচনার কয়েক ঘণ্টা পরই তিনি পরলোকগমন করেন। পত্র পাওয়া-মাত্র স্থির করি, লখনউ গিয়ে তাঁর জীবনের তথ্যাদি সংগ্রহ ক'রে এনে তাঁর জীবন-কথা রচনা করব। পরদিনই কাশী হয়ে লখনউ অভিমুখে যাত্রা করি।

সেখান থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, তার উপর নির্ভর করে এই জীবনকথা রচনা করা হল।

১৯৪৯ সালের ১১ই মার্চ তারিখে তিনি তাঁর আত্মজীবনী রচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু মাত্র কয়েক পাতা লিখেই সে-রচনা স্থগিত রাখেন। তা'তে নতুন ক'রে হাত দিতে পারেন নি। সেই অসমাপ্ত আত্মচরিতের পাণ্ডুলিপির কপিও তাঁর জীবনকথা-রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে।

শৈশবে সুরেন্দ্রনাথ 'খোকা ভগবান' নামে অভিহিত হয়েছিলেন, তাঁর জীবনকথায় এর উল্লেখ দেখে কলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীজিতেশচন্দ্র গুহঠাকুরতা পত্রযোগে জানান—

> …আমার যতদূর স্মরণ আছে তাতে সুরেন্দ্রনাথকে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী 'খোকা philosopher' আখ্যা দিয়াছিলেন। কবি ৺সতীশ-চন্দ্র রায় (শান্তিনিকেতন) মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভাইকে আমরা 'খোকা ভগবান' বলিয়া জানিতাম। আমার মাতুল ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ও সুরেনবাবুকে 'খোকা philosopher' বলিতেন। অশ্বিনীকুমার বিজয়কৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।…

সুরেন্দ্রনাথের জীবনকথা আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার কয়েকদিন পরে সুরেন্দ্রনাথের বন্ধু কবিশেখর কালিদাস রায়ও 'খোকা ভগবান' কথাই উল্লেখ করেছেন। তিনি 'দেশ' পত্রিকায় (২০শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা। ৩ জানুয়ারী ১৯৫৩, ১৯ পৌষ ১৩৫৯) সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে লেখেন—

> …আমার মত অভাজনকে তিনি বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন।… সুরেন্দ্রনাথ ৭।৮ বৎসর বয়সেই অধ্যাত্মবিদ্যার অতিজটিল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেন। কি করিয়া তাহা সম্ভব হইত সে রহস্য তিনিও

উচ্ছেদ করিতে পারেন নাই। এ কথা আমি তাঁহার মুখে শুনি নাই। শুনিয়াছিলাম পুরীতে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মঠের কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর কাছে। পরে আরও অনেকের কাছে এই তথ্যটি জানিতে পারি। এ তথ্যের যাহারা প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিল তাহারা বালক সুরেন্দ্রনাথকে বলিত—'খোকা ভগবান'।

প্রকাশ-তারিখ

আনন্দবাজার পত্রিকায় জীবনকথাগুলি প্রকাশের তারিখ—

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়	২৬ আগস্ট ১৯৫২।	১০ ভাদ্র ১৩৫৯
শ্রীচণ্ডীদাস ভট্টাচার্য	১৩ জানুয়ারি ১৯৫৩।	২৯ পৌষ ১৩৫৯
বসন্তরঞ্জন রায়	১৮ নবেম্বর ১৯৫২।	২ অগ্রহায়ণ ১৩৫৯
শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২১ অক্টোবর ১৯৫২।	৪ কার্তিক ১৩৫৯
শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য	৭ অক্টোবর ১৯৫২।	২১ আশ্বিন ১৩৫৯
শ্রীরাজশেখর বসু	৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫২।	২৪ ভাদ্র ১৩৫৯
শ্রীক্ষিতিমোহন সেন	২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৫২।	৭ আশ্বিন ১৩৫৯
সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত	৩০ ডিসেম্বর ১৯৫২।	১৫ পৌষ ১৩৫৯
শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ	২৭ জানুয়ারি ১৯৫৩।	১৩ মাঘ ১৩৫৯
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বাগচী	১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩।	২৭ মাঘ ১৩৫৯

দ্বিতীয় খণ্ডে আছে

শ্রীযদুনাথ সরকার

শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

শ্রীনন্দলাল বসু

শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

শ্রীনীলরতন ধর

শ্রীমেঘনাদ সাহা

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু